ঘরে-বাইরে

শ্রীমতী রেণু মিত্র, এম্. এ.

ভূমিকা—

ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১ ১ ৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, ক লি কা তা

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫২
মূল্য দুই টাকা

প্রিন্টার : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৭বি গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
মহারাজের শ্রীচরণে

তাং
হুগলী

ভূমিকা

য়ুরোপীয় সমালোচকদের মতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাঁর "ঘরে-বাইরে"। বিশেষভাবে জর্মানিতে এই বইখানি যে-ভাবে সর্বত্র বহুমানিত হয়েছিল তার তুলনা নেই। তার কারণ বোধ হয় এই যে বর্তমান যুগ-মানসের, বলা চলে যুগ-সংকটের, একটি চিরন্তন ছবি এই ঘটনা-বিরল, সূক্ষ্ম দৃষ্টিময় রচনাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। চারিত্র-বিশ্লেষণের দুচারটি মর্মরেখায় ব্যক্তিগত এবং বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার বহুদিক্ একই পটে আঁকা পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থে আধুনিক কালের রাষ্ট্রীয় সমস্যার পরিমণ্ডলও বাঙালি জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বজনীন সাহিত্যে পরিণত হল। অথচ সব মিলে "ঘরে-বাইরে" হৃদয়মনবেদ্য বেদনার শিল্প। নানা দেশের পাঠক তাই এই গল্পের আনন্দলোকে প্রবেশ ক'রে আপন জীবনের গভীর সন্ধান পেয়েছে।

সব দেশেই আজ বাহিরের জগৎ ঘরের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছে, একটি বৃহৎ বিমিশ্র সামাজিকতার দাবি বিপ্লবী মানববন্যায় চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু বহু বিক্ষোভের মধ্যে এরি অন্তরে আছে পারিবারিক জীবনকে অতিক্রম ক'রে বিচিত্রমুখী সহযোগিতার আহ্বান; ঘর ও বাহির আজ নূতনতর সম্বন্ধের যোগে প্রতিষ্ঠিত হোক্। অসাম্যে জর্জরিত, বুভুক্ষু, যুদ্ধরত মানব সমাজে সমবায় শক্তির সাধনা চাই; গড়বার কাজে যুক্ত না হলে স্বার্থের দেয়ালে বিভক্ত সনাতন সম্প্রদায় কল্যাণশক্তিকে ব্যর্থ করে দেবে। এই যুগ হবে সহমরণের যুগ, সহজীবনের নয়। ঘরে ঘরে তাই ডাক এসেছে পারিবারিক সত্যকে সুদৃঢ় রেখেই জনসেবার অঙ্গন উন্মুক্ত ক'রে দাও; তাতে আত্মীয় সম্বন্ধও মধুরতর হবে, সমাজের প্রাত্যহিক পরিবেশও যথার্থ মানবিক ধর্মসাধনার অনুকূল হয়ে উঠবে। সকল দেশেই

বিমলার উপরই দাবির প্রচণ্ডরূপ দেখা দিল ; গৃহলক্ষীকে তাঁর আপন সংসারের কেন্দ্রটিতে বিহার ক'রেই বিবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে প্রেরণা দেওয়া চাই, দেশের এবং দশের সংকটকালে আপন পরিবারের চেয়েও বড়ো পরিবারের কিছু দায়িত্ব না গ্রহণ ক'রে তাঁর উপায় নেই। বাহিরের দাবি ঝোড়ো মূর্তিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে ভারসামঞ্জস্য রাখা কঠিন হতে পারে, কিন্তু এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি নেই।

একদিকে ঘরের কেন্দ্র, অন্যদিকে তার পরিধি—দুয়ের সুমঙ্গল রূপ দেখা দেয় সচেতন নূতন প্রবর্তিত ব্যবস্থায়। পূর্বেও এই সমস্যা ছিল, কিন্তু আজকের দিনে ব্যাপকতর সমাজ বিধানের যোগে নিত্যকালীন আদর্শকে নূতন ক'রে প্রয়োগ করতে হবে। ঘর ও বাইরের শুভশক্তিসাধনায় প্রথমে নানা বিঘ্ন দেখা দেয়, কিন্তু যারা পরমাত্মীয়সম্বন্ধে যুক্ত তারা পরস্পর সহযোগী হলে বাহিরের মানবসত্যকে স্বীকার করেই সকল বিভ্রান্তিকে জয় করা চলে। কোন পুরুষ বা মেয়ের পক্ষে আজকের পরীক্ষায় একাকী উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন ; আত্মীয় পরিবারের নিগূঢ়তম সম্বন্ধের মধ্যেই বীর্য ও কর্মের উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজনের সময় ঘরের শক্তি একক হয়ে বাহিরের কঠিনতম দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। "ঘরে-বাইরে" গল্পটিতে দেখি একটি সুন্দর সংসার দোটানায় পড়ে টলমল ক'রে উঠ্‌ল ; নিখিলেশ বা বিমলা কেউই নূতন কালের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে মাধুর্য ছিল, কিন্তু অভ্যাসে অন্তর্লীন হয়ে ; সহযোগী কর্মে, দেশের কল্যাণব্রতে সংযুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়নি। নিখিলেশের ত্যাগশীল আদর্শের মধ্যে একটি দুর্গম একাকীত্ব ছিল, বিমলাকে তার যথার্থ সহধর্মিনী করবার চেষ্টায় বাধা ছিল সেইখানে। স্বদেশী যুগের প্রেরণাকেও আপন শক্তি ও বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকাশ করতে নিখিলেশের বিলম্ব হল তার কারণ বিমলার মধ্যে যে সহজ সামাজিক কল্যাণবৃত্তি ছিল নিখিলেশ তার পূরো সন্ধান পায় নি। এমন সময় উগ্র স্বাদেশিকতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হল সন্দীপ—

আন্দোলনের নেশাটাই তার মধ্যে প্রধান, কিন্তু সেই আতিশয্যের ধাক্কায় নিখিলেশের দেশসেবাও যথার্থ শক্তি নিয়ে দেখা দিল। বিমলার উপর দাবি এসেছিল ব্যক্তিগত লোভের রূপ নিয়ে, তারই সঙ্গে মিশ্রিত ছিল বৃহত্তর সামাজিক আহ্বান; বিমলাও চরম দুঃখে আপন চরিত্রকে উদ্বোধিত করেই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল। আত্মশক্তির জাগণের দ্বারাই তাহলে গৃহসংসার এবং বহিঃসংসারের সঙ্গে যোগ সত্য হয়, নিজেকে সংস্কারের জালে সংকুচিত ক'রে নয়। পরীক্ষার সময়টা দুঃখকর এবং তার মধ্যে লজ্জা ও গ্লানি প্রবেশ করে, কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'র অভ্রান্ত নির্দেশ কূলের দিকে, প্রলয়ের দিকে নয়। আত্মিক এবং স্বাদেশিক তীব্র আলোড়নের বাহন হয়ে এসেছিল সন্দীপ—সে এই বিভ্রান্ত যুগের প্রতীক মাত্র, কিন্তু তাকেও শেষ পর্যন্ত আগুনে পুড়ে আপন উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে জয় করার পথেই চলতে দেখা গেল। একথা মনে রাখতে হবে যে অন্যায়ের দ্বারা সন্দীপ ন্যায়বোধেরই জাগরণ এনে দিতে পেরেছিল, তার কারণ নিখিলেশ-বিমলার সংসারে বাহিরের কল্যাণযোগ আচ্ছন্ন থাকলেও কখনো অবলুপ্ত হয় নি। বাহিরের আঘাত এসে তাদের দুজনকে আরো কাছে টেনে আনল, জাতীয় কর্মের আহ্বানে তারা যথার্থ সতীর্থ হয়ে বিশ্বের পথে নিবিড় সামীপ্য আবিষ্কার করতে বেরোল। এই গল্পে ঘটনার আকস্মিক পরিণাম যাই হোক, প্রেমের মূল প্রতিষ্ঠা যে প্রেমিক দুজনেরই আত্মপ্রতিষ্ঠায়, এবং পারিবারিক সম্বন্ধও সহযোগী সেবা-ধর্মেরই উপর নির্ভরশীল, এই কথাটি "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের ভিতরকার কথা।

স্বাদেশিকতার সঙ্গে মানব মহাজাতির সম্বন্ধও প্রত্যেক দেশের স্বাধীন আত্মপ্রকাশের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু মানব-সম্বন্ধের জ্ঞানটুকু দেশপ্রেমের গভীর অন্তরে প্রথম হতে জাগিয়ে রাখতে হয়। অর্থাৎ আত্মসাধনা এবং বিশ্বসাধনা কোনো ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী নয়, দুয়ের যোগেই দুয়ের সত্য। এখানেও "ঘরে-বাইরে" গল্পে মানবসমাজের যাথার্থ্যবিধান কোন্ পথে সম্ভবপর তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন।

এই সমালোচনা-গ্রন্থের লেখিকা উপন্যাসটির তাৎপর্য প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত ও যুক্তির সহযোগে উপস্থিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে আজ যথার্থ সমালোচনার অভাব দেখতে পাই, তার কারণ যে মননশীল, সমগ্রদৃষ্টির পরিচয় এই লেখাটিতে আছে তার আদর্শ আমরা এখনো গ্রহণ করতে পারি নি। লেখিকা তাঁর অসামান্য অনুশীলনশক্তি এবং শ্রেয়বিচার দ্বারা এই গল্পের নিহিতার্থ প্রকাশ করেছেন। "ঘরে-বাইরে" গল্পের আত্মপ্রকাশতত্ত্ব এবং বিবিধ ব্যক্তিগত সম্বন্ধগুলিকে তিনি নবীনকালের ভূমিকায় দেখাতে পারলেন কেননা চিরকালীন সত্যের বোধ তাঁর মধ্যে উজ্জ্বল। দার্শনিক মন তাঁর সাহিত্যদর্শনকে আচ্ছন্ন করে নি, শিল্পের অন্তরলোকেরই সন্ধান দিয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নূতন, এবং মৌলিক গবেষণায় লব্ধ তাঁর ভাবগুলিকে তিনি সুমিত সুভাষিত বাক্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভাদ্র, ১৩৫১।

অমিয় চক্রবর্তী

স্বীকৃতি

ভারতবর্ষ একদিন তার গীতা উপনিষদের পরিপূর্ণতার উপাসনা ছেড়ে দিয়ে জীবনে শূন্যতার ধ্যানকে গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘদিনে তারই ফল দাঁড়িয়েছে সর্বক্ষেত্রের শূন্যতা—ধর্মে, রাষ্ট্রে সমাজে, পরিবারে, ব্যক্তিগত সত্তায়।

বর্ত্তমান কালে সমঞ্জসের পূর্ণতার জীবনদর্শন দিয়ে গেলেন সমন্বয় মূর্তি পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল দেব। এই জীবনদর্শনকে আস্বাদন করেছি তাঁর চরণাশ্রিত শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের বইগুলিতে (যেখানে তিনি সেই দর্শনকে দর্শনোচিত রূপ দিয়েছেন) আর তাঁর বিস্তৃত ও গভীর জীবনে। আজ এই দিনে আমি তাঁদেরকে অবিরত ধ্যান করছি। জীবন-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এই রচনাতে সেই সমঞ্জসের আস্বাদনই করতে প্রয়াস পেয়েছি। যাঁরা আমার এই দীন প্রচেষ্টাকে তাঁদের স্নেহ, আশীর্বাদ ও অভিমত দিয়ে নানাভাবেই সাহায্য করে এসেছেন, তাঁদের আজ আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আর যে পাঠকদল আমার বইটি আগ্রহের সঙ্গে পড়েছেন—যাতে করে এত তাড়াতাড়ি আমাকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে হল—তাঁদেরও আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

মানুষের সভ্যতা আজ নিজের রক্ত নিজে পান করার উন্মত্ততায় ক্লান্ত। বিশ্বের এই দুর্দিনে এই সমন্বয়ের জীবন দর্শন ঘরে বাইরে জমাট বেঁধে উঠুক এই আমার কামনা।

বাসন্তী অষ্টমী, চৈত্র, ১৩৫২
১৮এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কালীঘাট, কলিকাতা

রেণু মিত্র

রবীন্দ্রনাথের

ঘরে-বাইরে

ভূমিকা

এই বিশ্বের প্রতি চাহিয়া বিস্ময়বিমূঢ় মানুষ সেই আদিম-কালেই প্রশ্ন করিয়াছিল "কিমিদম্"। তাহার পর পৃথিবীর এই দীর্ঘদিনের ইতিহাসে মানুষ জ্ঞানে বুদ্ধিতে নিজেই বহু বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তবু বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতি চাহিয়া আজও সেই পুরাতন বিস্ময়েই সে প্রশ্ন করে "কিমিদম্"। বিশ্ব-সৃষ্টির কেবল বাহিরের দিকই নয়, সেই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নিজের প্রতি চাহিয়াও মানুষের বিস্ময়ের অন্ত নাই। কিন্তু কেন এই বিস্ময়? ইহার কারণ এই যে সমস্ত সৃষ্টিই "প্রাণের" প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। কেন এই প্রকাশ, কী ইহার হেতু—এ প্রশ্নের উত্তর নাই। এ প্রকাশ অহৈতুক। প্রাণধারা অফুরান, তাই সৃষ্টি-রহস্যেরও অন্ত নাই, মানুষের বিস্ময়বোধও চিরদিনের। প্রাণকে কোনদিনই পরিপূর্ণ-ভাবে আয়ত্ত করা যাইবে না, তাই ইহার প্রতি মানুষের বিস্ময়ও কোনও দিনই শেষ হইবে না। এই প্রাণধারা অনন্ত

বিশেষত্বের মধ্য দিয়া নিজেকে ফুটাইয়া তুলিতেছে, কিন্তু নিজের কোন বিশেষ প্রকাশের মধ্যেই নিজে বাঁধা পড়ে না—তাই ইহা নির্বিশেষও। ইহার কোন বিশেষত্বের মধ্যে ইহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলে দেখি, সেই বিশেষ প্রকাশকে ছাড়াইয়াও ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সৃষ্টির মধ্যে প্রবাহিত এই বিস্ময়কর প্রাণধারাকে আমরা প্রত্যেকেই নিজের মত করিয়া ব্যবহার করি, কিন্তু আমাদের কোন ব্যবহারের মধ্যে বাঁধা না পড়িয়া এই প্রাণের লীলা কোন্ অনাদিকাল হইতে বহিয়া আসিতেছে, কোন্ অনন্ত কাল পর্যন্ত বহিয়া চলিবে। সেইজন্যই সৃষ্টি-রহস্য-উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসী প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ উপনিষদের মধ্যে ইহাকে 'অব্যবহার্য' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত এই গূঢ় রহস্যকে বুঝিবার জন্য বহু যত্ন করিয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে ব্যাখ্যাত ইহার কোন প্রয়াসটিই অবজ্ঞেয় নয়, কিন্তু কোনটিই চূড়ান্তও নয়, একমাত্রও নয়। সৃষ্টির অনেকখানিই আমরা জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখি আমাদের সে-জানাকে ফাঁকি দিয়া নূতন বেশে সে আবার উপস্থিত,—কোনদিনই ইহার নবীনতা ও সরসতার অন্ত পাওয়া গেল না।

শ্রেষ্ঠ ও সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষেও একথা পূরাপূরিই সত্য। কেননা সাহিত্যে বহিঃপ্রকৃতির ছন্দে কিংবা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বিচিত্র দ্বন্দ্বে সেই অফুরান প্রাণের একই লীলা। সাহিত্য "is the response of man's creative soul to the call of the real." এবং সাহিত্য criticism of life

নয়, creation of life.—জীবনের সমালোচনা নয়, জীবনের সৃষ্টি। যে-সাহিত্য যত বেশি ব্যাপক ও গভীর "জীবন"-চিত্রাঙ্কনে সমর্থ, সেই সাহিত্যের মধ্যে প্রাণের সংস্কারহীন লীলার ততই স্ফূর্তি। জীবনের এই গভীরতা ও ব্যাপকতাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। ইহা আছে বলিয়াই একটি প্রাকৃত জীবনকে যেমন একটিমাত্র কথার মধ্যে বা একটিমাত্র ব্যাখ্যার মধ্যে ভরিয়া রাখা যায় না, তেমনই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে কোন একটি মাত্র ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত নয়। সাহিত্য প্রাণেরই অভিব্যক্তি বলিয়া এবং প্রাণের যে-কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্মের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি তাহার সার্থক আস্বাদনের জন্যই জীবনের মত সাহিত্যকেও এত বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখা সম্ভব হইতেছে। এবং সম্ভব বলিয়াই প্রতি পাঠক নিজের প্রকৃতি অনুসারে একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে নিজের মধ্যে পুনর্জন্ম দান করে। যে মনীষী সমালোচক সমালোচনা-সাহিত্যকে creative art বলিয়াছেন, তিনি এই জন্যই অত্যন্ত সত্য কথা বলিয়াছেন।

সমালোচনা-সাহিত্য creative art বলিয়া আমি যখন Faust পড়ি তখন সে Faust আমার Faust বটে কিন্তু জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ভালমন্দের কোন বাঁধা গৎ-এর মধ্যে ফেলিয়া আমি উহার বিচার করিতে পারি না। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেও সাহিত্য রচিত হয় সত্য কিন্তু কালের দরবারে উহা টেকে না। উহা নেহাৎই সাময়িক সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুধর্মের তথাকথিত আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য সাহিত্য রচনা সম্ভব, সমাজের কুসংস্কার দূর করিবার জন্যও সাহিত্য লেখা চলে; কিন্তু

এই দুইটিই যে-জীবন চিত্রে মুখ্য হইয়া দাঁড়ায় তাহা সর্বকালের সর্বজনের সাহিত্য হইতে অনেক দূরে রহিল। কেননা তাহা জীবনের পরিপূর্ণ স্বরূপ হইতেই অনেক দূরে। কিন্তু জীবনের মুক্ত স্বরূপের একটি চিত্র আঁকিলে তাহা যেমন কোন বিশেষ কালকে সার্থক করিয়াও তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই কোনও বিশেষ সংস্কারকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে না ; সকল সম্ভাবনাময় জীবন-ধর্মের বিরাট রূপটিই শুধু ফুটাইয়া তোলে।

সাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। তিনি বৈচিত্র্যময় অফুরান প্রাণধর্মের উপাসক ; তাঁহার রচনার মধ্যেও সেই প্রাণধর্মেরই প্রতিফলন। সেইজন্যই কোন বিশেষ হেতু, ঘটনা বা কালের পরিচয় তাঁহার অনেক রচনার অনেক স্থানেই পাওয়া গেলেও তাহা সেই সঙ্গেই সেই বিশেষ হেতু, ঘটনা বা কালকে ছাড়াইয়া যায়। তাঁহার রচনা এই জন্যই একইকালে বিশেষ কিছুর অতীতও (transcendental) বটে, অনুগও (immanent) বটে। কেবলমাত্র সাময়িক হেতু বা উদ্দেশ্যে লেখা সাহিত্য যে রবীন্দ্রনাথের একখানাও নাই, হয়তো তাহা নহে। কিন্তু যদি বলি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই প্রাণের বিশেষ ধর্মগুলিকে অনুধাবন করিয়াই বিশেষ দেশকাল-পাত্রকে ছাড়াইয়া সর্বকালীন হইয়া দাঁড়ায় তবে বোধ হয় এতটুকুও অসত্য বলা হয় না। তাঁহার সকল রচনার বিশিষ্ট ধর্মই ইহা।

প্রাণের স্তরে বস্তু এবং বস্তুর অতীত অবস্থা, ভাব ও রস

এত পাশাপাশি, ওতপ্রোতভাবে এবং একই সময়ে অবস্থান করে যে জীবনের বাস্তব ঘটনা দিয়া না বুঝিলে কিছুতেই সেখানে নাগাল পাওয়া যায় না। বুদ্ধিতে যতটা বোঝা যায় তাহার বাহিরেও যে জীবনের অনেকটা বাকি পড়িয়া থাকে এবং তাহাকে কিছুতেই যে বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আনা যাইতে পারে না—একথা মনে রাখিতে না পারিলে জীবনের দুর্জ্ঞেয়ত্ব কেবলই বাড়িয়া যায়। জীবনের মধ্যে যাহা সহজ, বুদ্ধির খণ্ডিত দৃষ্টিতে তাহাকে হয়তো কোন মতেই প্রমাণ করা যায় না। কেননা বুদ্ধি জীবনের অনেক উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান মাত্র। সেইজন্যই সাহিত্যে যে জীবন অঙ্কিত করা হয় তাহাকে শুধু বুদ্ধিতে বুঝিতে চাহিলে তাহার অনেকখানিই বাদ পড়িয়া যায়; তাহাকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেই প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও তৃপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, রচনা তো অর্থগ্রহণ করিবার জন্য নয়, সেই রচনাকেই গ্রহণ করিবার জন্য। "আমার (রচনার) মধ্যে প্রাণ বলে উঠেছে সুখে দুঃখে কাজে বিশ্রামে জয়ে পরাজয়ে লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি-আছির জয়, জয় এই আনন্দময় আমি-আছির জয়—"। রচনা কেবল এইটুকু ছাড়া আর কিছুই বলে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝিতে হইলে এই "আনন্দময় আমি-আছির" দৃষ্টির পরিচয়ে বুঝিতে হইবে। বুদ্ধির ক্ষেত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া যাহার যুগপৎ অবস্থিতি অসম্ভব বলিয়া দেখি, প্রাণের অখণ্ড ও সমগ্র দৃষ্টিতে তাহাও যে সম্ভব, রবীন্দ্রনাথের "গোরার" মধ্যে তাহার একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাইব। এক সময় সুচরিতার দিকে চাহিয়া

গোরার মধ্যে কি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার বর্ণনায় আমরা একই কালে কি করিয়া সমগ্রতা এবং প্রতিখণ্ডের স্বতন্ত্রতা একত্র অনুভূত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত পাই। সেখানে আছে—"...দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃই সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছের শাড়ির পাড়টুকু পর্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একই কালে সমগ্রভাবে সুচরিতা এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।"—এই অবস্থাটি একমাত্র প্রাণের অখণ্ডতার মধ্যেই সম্ভব—কী জীবনে, কী সাহিত্যে। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইহাই বিশেষ কথা।

জীবনের মধ্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বৈচিত্র্যের যে-সাহিত্য তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার মত সর্বজনীন সাহিত্য বর্তমানকালে খুব বেশি আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা সম্ভব হইয়াছে এইজন্যই যে একই সঙ্গে transcendental (অতীত বা পর) ও immanent (অনুগ) অবস্থা-সমন্বিত জীবনের রূপের খবর তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়াছিল। ভারতীয় চিন্তাধারায় পুষ্ট ও তথাকথিত ভারতীয় বিকৃতধর্মের ব্যবস্থামুক্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই দৃষ্টি একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে "সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য"; "হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণ মাত্র"; "হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষকরা"র উদ্দীপনাকেই শুধু রবীন্দ্রনাথ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গির

ফলেই তাঁহার সাহিত্য এত বেশি সর্বজনীন হইতে পারিয়াছে; বিশেষ দেশ কাল ঘটনা বা পাত্রকে স্বীকার করিয়াও তাহাকে প্রতি মুহূর্তে ছাড়াইয়া যাইতেছে। বিশ্বসৃষ্টির মালমসলা যখন সাহিত্যকারের কল্পনার প্রতিভার মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া আসে তখনই তাহা স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ ধর্ম প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কতকাংশে বিশ্বজনীনতা লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজনীনতা রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশিষ্ট ধর্ম—প্রাণ-দৃষ্টির প্রতি-ফলনের জন্য।

সাহিত্যে যে মানুষের জীবনের সংস্কার-মুক্ত রূপটিই প্রকাশ করা হয়, কোনও বিশেষ হেতু বা উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য রচনা সম্ভব হইলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিতে যে জীবনের ঐ ব্যাপক ও গভীর রূপাঙ্কনই বুঝায়, কোন বাধা গৎএর মধ্যে ফেলিয়া তাহাকে বুঝিতে গেলে যে তাহা ব্যর্থ প্রয়াস হয়—এই কথাকয়টি এক কালে আমাদের দেশের লোকের একেবারেই জানা ছিল না। তখন সাহিত্য-বিচার চলিত কোন্‌টি হিন্দুধর্মের অনুযায়ী হইয়াছে, কোন্‌টি হয় নাই—এমনই একটি দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া। তাই রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" যখন রচিত হইতে লাগিল, তখন জনসাধারণের নিকট প্রতিভার ভাগ্যে যে-লাঞ্ছনা চিরদিন লেখা থাকে, সেই লাঞ্ছনা রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেশের লোককে সেদিন সাহিত্য বিচারের নমুনা বুঝাইতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথকে যে বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা আমরা "ঘরে-বাইরে" সম্পর্কে যে-সব আলোচনা রবীন্দ্রনাথকে করিতে হইয়াছিল, তাহার মধ্যে পাই। বিশেষ কোন ঘটনা বা কাল প্রাকৃত

বিষয়বস্তুরূপে সাহিত্যকারের দৃষ্টির সম্মুখে থাকিলেও এবং সেগুলির ছাপ তাঁহার রচনার উপর পড়িলেও সমগ্র রচনাটি কিভাবে সাময়িকতাকে অতিক্রম করিয়া জীবনের চিরন্তনতাকে, জীবনের মুক্তস্বরূপকে প্রকাশ করে সে সম্বন্ধে এবং লেখক যে কোন হেতু বা উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া লেখেন না, তিনি যে জীবনকেই সম্মুখে রাখিয়া, জীবনের সম্ভাব্যতার মনস্তত্ত্বকে অনুধাবন করেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উপরের কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া আমরা তাঁহার "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসখানির মধ্যে কবিচিত্তের কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা দেখিব। লেখক যে বিশেষ সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা দিবার জন্য লেখেন না—এবং ইহার মধ্যেই যে, লেখকের ভালমন্দ লাগা মিশিয়া যায়, তাহা কবির জবানীতেই তাঁহার আলোচনার মধ্যে পাইয়াছিলাম। তাই "ঘরে-বাইরে"র মধ্যে জীবন-চিত্ররচনায় রবীন্দ্র-ব্যক্তি-মানস হইতে জীবনের বুদ্ধি-প্রেম-আনন্দ-বেদনা কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আমরা তাহা দেখিব। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বা আনন্দের প্রকাশের মধ্যে, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আমরা পাঠকেরা তাঁহার আনন্দ-জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রেমের খোঁজ করিয়া থাকিব, ইহা আমাদের পক্ষেই স্বাভাবিক এবং রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য হিসাবে সার্থক হইতে হইলে ইহা উচিতও বটে।

"ঘরে-বাইরে" লেখা হয় ইংরাজী ১৯১৬, বাংলা ১৩২৩ সালে। সেই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের অপরাপর রচনা এইগুলি—

শান্তিনিকেতন ১৫, ১৬, ১৭ ভাগ, পরিচয়, ফাল্গুনী, চতুরঙ্গ, বলাকা ইত্যাদি।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত এই পংক্তি দুইটি, জীবন সম্বন্ধে একটি গভীর তত্ত্ব বা সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে। মানুষ যে শুধু ঘরের নয়—কিংবা শুধু বাহিরের নয়, ঘর এবং বাহির উভয়ত্রই যে তাহাকে সুস্থভাবে বিচরণ করিতে হয়—মানুষ যে শুধু আপনাকে লইয়া সমাপ্ত হয় না, পরকেও যে আপন করিতে হয়, পরের মধ্যেও যে আপন সত্তাকে বিস্তৃত করিতে হয়, আবার আপনজনের সঙ্গে যে একটা 'পর' সম্বন্ধ, একটা আপনের অতীত সম্বন্ধ রাখিতে হয়—এই কথাটিই বলা হইল। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন—"ঘর বলে পেয়েছি, পথ বলে পাইনি। মানুষের কাছে 'পেয়েছি' তারও একটা ডাক আছে, আবার 'পাইনি' তার ডাকও প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে, পথ নেই, সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে ঘর নেই, সেও তেমনি মানুষের শাস্তি। শুধু পেয়েছি বদ্ধ গুহা, শুধু পাইনি অসীম মরুভূমি।" এই যে ঘর এবং বাহির অথবা ঘর এবং পথ, এই যে আপন এবং পর, এই যে পেয়েছি এবং পাইনি—এই দুইটি মিলাইয়া মানুষের সম্পূর্ণতা। এবং এই দুইটিরই অপর নাম জীবনের স্থিতি এবং গতি। কোন মানুষই সম্পূর্ণ ভাবে নিজের নয় অথবা পরেরও নয়—কেবল ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটে

না—সে ব্যক্তিগত জীবন যত সম্পূর্ণই হউক না কেন; বাহিরের বিশ্বের একটা ডাক আছেই। নিজেকে সে বিস্তৃত করিবেই—অপরের হৃদয়ে, অপর কর্মে একটা বিস্তৃতি ছাড়া তাহার বিশ্ব-রূপের আস্বাদন পূর্ণ হইবে না। ঘরকে ঘর রাখিয়া, বাহিরকে বাহির রাখিয়া এবং উভয়কেই মিলাইয়া; আবার ঘরকে বাহির করিয়া, বাহিরকে ঘর করিয়া পাওয়া—মানুষের পাওয়াকে এই এতগুলি স্তরে সমসংন্যস্ত করিয়া লইতে হয়। তবেই হয় জীবনটা সোজা, সহজ ও স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সেই পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ, যে পাওয়ার সাথে না-পাওয়া মিশিয়া আছে।" এই জগতের স্বরূপই এই যে ইহার নিজের মধ্যেই নিজের অতীত একটা রূপ আছে। জগৎ মূলতঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষের অতীত একটা "পর" অবস্থা—এই দুইয়ের সম্মিলনে রচিত বলিয়া ইহার প্রত্যেক ঘটনা, বস্তু ও ভাবের মধ্যে এইরূপ দুইটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই দুইটি অবস্থা যে পৃথক্ সময়ে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে তাহা নয়—একই সময়ে একই বিষয়ে এই দুই অবস্থা মিলিয়া মিশিয়া থাকে। সীমার সঙ্গে সীমাতীতের, খণ্ডের সঙ্গে খণ্ডাতীতের, পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়ার, ঘরের সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক একই সময়ে একই বস্তুতে বিদ্যমান। একমাত্র প্রাণের ক্ষেত্রেই এইরূপ বিপরীত দুই বস্তুর একই সময়ে একই বস্তুতে থাকা বাস্তব এবং একমাত্র জীবনের মধ্যেই আমরা তাহার পরিচয় পাইতে পারি। সমগ্র এবং প্রত্যেক বিশেষ—এই দুই বিপরীত

বস্তু যে কেমন করিয়া যুগপৎ থাকিতে পারে, মন কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিবে না ; কেন না মনের ধর্ম ই হইতেছে বিপরীত-ধর্মী বস্তুর যুগপৎ জ্ঞান না হওয়া। প্রাণের ক্ষেত্রে কিভাবে উহা অনুভব করা যায় "গোরা" হইতে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জগতের এই স্বরূপকে বুঝিতে পারিলেই পাওয়ার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। সত্যিকার পাইতে হইলে ব্যক্তিগত জীবন Self-life, বিশ্বগত জীবন Cosmic-life, ঘরে এবং বাইরে—উভয়ত্রই ছন্দ বজায় রাখিয়া পাইতে হয়। প্রতি দুইটি বস্তুর মধ্যে, প্রতি দুইটি মানবের মধ্যে একটা বিশ্ব-রূপের অর্থাৎ বাহিরের বিশ্বের অনন্ত ঘটনাবলীর একটা ব্যবধান মানিয়া লইয়াই পাইতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলিলেন—

"সংসারেতে আর যাহারা আমায় ভালবাসে
তারা আমায় ধরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে,
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া তাই তোমারই নূতন ধারা
বাঁধ নাক লুকিয়ে থাক ছেড়েই রাখ দাসে"।

—সেখানে 'ছাড়িয়া'-রাখিয়া পাওয়ার অর্থ ঐ বিশ্বরূপের ব্যবধান মানিয়া লইয়া পাওয়া। "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের মধ্যে এই সকল সত্যগুলির সুন্দর আস্বাদন পাওয়া যাইবে। বস্তুর যে একটি নিজস্ব মূল্য আছে, সে যে তাহার মূল্যেই বিশ্বের দরবারে বিচার পাইবার সামর্থ্য রাখে, তাহার সেই মূল্যকে একেবারে অস্বীকার করা যে কোন মতেই সম্ভব হয় না—বস্তুকে যে তাহার স্বরূপে বুঝিতে হয়, বস্তুর স্বরূপকে নিজের মনের রঙে রাঙাইয়া

লইলে যে সমস্তই বিকৃত হইয়া যায়—এই কথাটাও "ঘরে-বাইরের" মধ্যে পাওয়া যাইবে। সেখানে নিখিলেশ এ বিষয়ে একটি সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত দিয়াছে। উহা এই—"যে-পেটুক মাছের ঝোল ভালবাসে, সে মাছকে কেটেকুটে সাঁতলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়। কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভরতি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভাল, না পারে তো ডাঙ্গায় বসে অপেক্ষা করে—তারপরে যখন ঘরে ফেরে তখন এটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাইনি কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করিনি। আস্ত পাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয়, তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।"

এই সংসারে প্রত্যেকটি মানুষ যে "পেয়েছি" ও "পাইনি", ঘর ও বাহির অথবা স্থিতি ও গতির সমন্বয়ে গঠিত—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার কোন একটিরই একান্ত আধিক্য জীবনের পক্ষে মারাত্মক। স্থিতিহীন গতি উচ্ছৃঙ্খলতা, গতিহীন স্থিতি ক্লৈব্য। আমাদের দেশে দীর্ঘদীনের সংস্কারের ফলে আমরা এতদিন পর্যন্ত জীবনের স্থিতিটাকেই, পাওয়াটাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি। সেই দৃষ্টিতে জীবনের গতি, জীবনের "না-পাওয়ার" দিক্ বন্ধ করার দিকে ছিল আমাদের সকল প্রচেষ্টা—তাই আমরা গতির ক্ষেত্র এই পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে নিদারুণ ব্যর্থতারই

পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। গতি-ক্ষেত্র এই বিশ্বের বাহিরের দিকটাকে অসত্য বলিয়া জানাতে আমরা পরিবারে পিষ্ট, সমাজে দলিত ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাধীন থাকিয়াও আমাদের জীবনে কোন ব্যর্থতা বোধ করি নাই। আমরা কোন মতে যেন-তেন প্রকারেণ সংসারটাকে সারিয়া ফেলিয়া কেবল ব্রহ্ম-চিন্তাই প্রধান বলিয়া জানিয়া লইয়া সেই ভাবেই চলিয়া ছিলাম। কিন্তু উহাই জগতে ও জীবনে একমাত্র সত্য নয়। তাই প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রতিপদে আমরা ব্যর্থ; জীবনের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে আমরা দীপ্তিহীন। কিন্তু সে ব্যর্থতার বোধও আমাদের চলিয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ যখন কেবল আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে নয়, আমাদের সকল কৃষ্টির উপরেও খেলিয়া গেল তখন সেই জোয়ারে এতদিনকার সংস্কার আর রক্ষা করা গেল না। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা বহুদিন সংস্কারাচ্ছন্ন থাকিলেও একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এজন্য বাহিরের দিক হইতে একটা টানের প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার টানে আমাদের মানবিক সত্তা তাহার এতদিনকার অবরুদ্ধ গতির মুখটাকে খুলিয়া দিল। আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রগত জীবনে সেই সভ্যতা অবাধ প্রবেশ করিতে লাগিল। আমরা জীবনের আর একটি দিক সম্বন্ধে সচেতন হইলাম।

এমনই একটি জোয়ারের ধাক্কা স্বদেশী আন্দোলনের রূপে নিখিলেশ-বিমলার দাম্পত্য জীবনকে কোথায় কিভাবে আনিয়া ফেলিল আমরা তাহা দেখিব। এবং পূর্বে যে-সকল ভাব বা সত্যগুলির উল্লেখ করা গিয়াছে, "ঘরে-বাইরে" উপন্যাস বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা তাহারও কোথায় কিভাবে পরিচয় পাই তাহা দেখিতে পাইব।

প্রথমেই দেখিতে পাই নিখিলেশ-বিমলার দাম্পত্য-জীবন। সেই জীবনের পটভূমিকা সাবেক নিয়মে বাঁধা একটি জমিদার-পরিবার, তাহার "কতক কায়দা-কানুন মোগল-পাঠানের কতক বিধি-বিধান মনু-পরাশরের"। কিন্তু সেই পরিবারের যাহাকে লইয়া প্রধানতঃ আমাদের কাহিনী, সেই নিখিলেশ একেবারে একেলে। তাহার পরিবারে সে কিছু খাপছাড়া। সে শিক্ষিত, উচ্চ মনোভাবাপন্ন, আত্মজিজ্ঞাসু। জীবনকে সে প্রতিপদে বিশ্লেষণ করিয়াই চলে—কিন্তু তাহার জীবনের মূলে রহিয়াছে প্রেম—তাই সব বিষয়কে সে প্রেমের মুক্তির আলোকেই বিচার করে। সে পরোপকারী, কিন্তু উপকার করিয়া অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। সর্বোপরি সে প্রেমিক। এ বিষয়ে তাহার পরিবারে সে অদ্ভুত। সেই পরিবারে একনিষ্ঠ প্রেম অভাবনীয়—"মানী সংসারের তরীটাকে একটী মাত্র স্ত্রীর আঁচলের

পাল তুলে দিয়ে চালানো,”—সে যে বড় অসঙ্গত, বড় অদ্ভুত। এখানে অল্প স্ত্রী-ই তাহার যথার্থ সম্মান পাইয়াছে। কিন্তু নিখিলেশ তাহার স্ত্রী বিমলাকে একান্ত ভালবাসে। বিমলার জবানীতে সে ভালবাসা এইরূপ—“তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি; আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য”। কিন্তু নিখিলেশের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কথাটি এই যে, সে জীবনে যাহা পাইয়াছে, যাহা ঘর বলিয়া তাহার পরিচিত তাহাতেই সে তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, যাহা তাহার বাহির, তাহার বিশ্বরূপের জীবন সেই পথের ডাকও তাহার জীবনে সমভাবেই প্রবল। ক্ষুদ্র প্রাপ্ত লইয়া ক্ষুদ্র আবেষ্টনের মধ্যে সন্তুষ্ট না থাকিয়া জীবনটাকে কিভাবে একটা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সার্থক করিয়া তোলা যায়, ঘরের মধ্যে যাহা বিশেষ করিয়া পাইয়াছি, বাহিরের বিস্তৃতির মধ্যেও তাহাকে কেমন করিয়া পাওয়া যায়—ভিতরে ভিতরে বিরাটের এই আকর্ষণ নিখিলেশকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। সেই জন্যই সে আত্মতৃপ্ত বিমলাকে বলিত—“আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনা-পাওনা বাকি আছে”। বিমলা একথা কিছুই বুঝিতে পারে না। সে বলে বাইরেতে তাহার দরকার

কিসের ? সে মনে করে তাহার ক্ষুদ্র আবেষ্টনের মধ্যে স্বামীকে পাইয়া ও নিজেকে দিয়াই সে তৃপ্ত। সে মনে করে পাওয়ার সে চরম পাইয়াছে ; দিতেও সে সবই দিয়াছে ; কোনও দিকেই তাহার আর কিছু করিবার নাই। সে জানে না বাইরেতে যে কেবল তাহার দরকার তাহাই নয়, বাহিরেরও তাহাকে দরকার আছে। সংসারে দেনা-পাওনাটা যে এত সোজা এবং স্বল্প বস্তু নয়, তাহা তাহার ধারণায় আসে নাই। ঘরের মধ্যে পাওয়াই যে পাওয়ার সম্পূর্ণ রূপ নয় ; বাহিরের জীবনেও যে আমার দরকার আছে, আমাকেও যে বাইরের দরকার আছে—একথা জানে না বলিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিতে পারে—"কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়" ? নিখিল ইহার উত্তরে বলে—"এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কাণ মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না"। কিন্তু বিমলা আত্মজিজ্ঞাসু নহে, তাই এ সকল কোন কথাই সে বুঝিতে পারে না। মানুষের জীবনের সেই 'পাইনির' ডাক আজও বিমলার জীবনে অনুপস্থিত। নিখিল যখন বলে—"তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয়, তবেই আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে।" তখন মূঢ়ের মত বিমলা উত্তর দেয় "পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই

বাকি নেই"। এক একটা মানুষের গোটা পরিচয় যে কী বৃহৎ, কত বিস্তৃত ও কত গভীর, বিমলা তাহা জানিবে কি করিয়া ? তাই সে মনে করিতে পারিল যে, তাহাদের দুজনকার পরিচয়ই সে জানে। বিমলাকে বাহিরে আসিতে বলার সময় নিখিলের ভাবনাটা ছিল এই রকম—"বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে, সে ছিল আমার ঘরগড়া বিমল, ছোট জায়গা এবং ছোট কতকগুলি বাঁধা নিয়মে তৈরী। তার কাছ থেকে যে-ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপ্যালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো" ? বিমলকে সে যতটুকু পাইয়াছিল, তাহার অপেক্ষাও সে যে বেশি চাহিত, তাহাতেই যে সে তৃপ্ত ছিল না তাহার কারণ সে যে লোভী ছিল তাহা নয়—সে ছিল প্রেমিক। তাই সে তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের মাল চায় নাই, নিজে ধরা না দিলে যাহাকে ধরা যায়না, তেমন বস্তুই চাহিয়াছিল। সে বলে —"স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি ; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল"। অন্যত্র নিখিল বলিয়াছে—"সৃষ্টিকর্তার ইশারা দিয়ে নিজের জীবন-টাকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব, একটা বড়ো আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব এই বেদনা বরাবর আমার মনে ছিল।" অমনি একটা অতৃপ্তি লইয়া সে বিমলাকে বাহিরে আসিতে বলিয়া আসিতেছিল। এমন কথাও সে বিমলাকে

নাই বটে কিন্তু কোম্পানির কাগজ অনেক ডুবিয়াছিল। কিন্তু এই গতিক্ষেত্রেও কোথায় তাহার ত্রুটি ছিল তাহা আমরা পরে দেখিব। গতির এই একটা দিক থাকা সত্ত্বেও জীবনে তাহার ভাবুকতা, অন্তর্মুখীনতাই প্রধান—উহাই তাহার প্রকৃতির স্বরূপ। সে প্রেমিক বটে, কিন্তু সেই প্রেমও অন্তর্মুখীন; উহা যে ভাষায়, যে ইঙ্গিতে, যে কর্মে ব্যক্ত হয় তাহাতে নারীর সকল ক্ষুধা মেটে না। সে আবেগে চঞ্চল নয়। তাহার মধ্যে বহিঃপ্রকাশ কি রকম কম ছিল তাহা সে নিজেই এক সময়ে বুঝিতে পারিয়া বলিতেছে—"আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ, আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পথ পায় না। আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই, তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পারবে কেন? বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেই জন্যে এই ন-বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য সে আমার কাছে পুরানো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো—বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল, তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি"। নিখিলের এই কথাগুলি হইতেই বুঝা যাইবে সকল থাকা সত্ত্বেও কী তাহার ছিল না। প্রকাশহীন দীপ্তিহীন তাহার মধ্যে ছিল কেবল বোবা গভীরতা। কিন্তু জীবন যে একটি সমগ্র পদার্থ—সেখানে

যে শুধু প্রকাশহীন বোবা গভীরতা একেবারেই অকেজো ; শুধু গভীরতায় যে সেখানে চলে না, শুধু গভীরতা যে জীবনে সত্য নয়, পরিপূর্ণ নয়—নিজের এবং অপরের ভিতরকার অন্যান্য আহ্বানও যে জীবনের আছে—তাহাতেও যে সাড়া দিতে হয়, জীবনকে যে একই সাথে গভীর ও বিস্তৃত করিতে হয়, জীবনের অন্তর্নিহিত গতি ও স্থিতিকে সুন্দর সমন্বয় করিয়া চলিতে হয়—ঝড়ের দামামার মধ্য দিয়া সেই কথাটি নিখিল বুঝিতে পারিয়াছিল।

নিজের সম্বন্ধে নিখিলেশ অন্যত্র বলিয়াছে—"পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সবচেয়ে খোঁজে, আমার স্বভাবে হয়তো সে জোর নেই···।" জোর বলিতে বিমলা যাহা বুঝিত, যে-জোর নিখিল অপছন্দ করিত—তাহার কতটুকু সত্য ও সার্থক সে বিচার বাদ দিলেও অতিরিক্ত অন্তর্মুখীন হওয়ার যে ত্রুটিটুকু তাহা যে নিখিলের ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ যে নাই তাহা নিখিলের প্রতি সমালোচকদের 'নির্জীব' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগই প্রমাণিত করিবে। নিখিলের সকল আদর্শ সত্ত্বেও যে অমূল্য বিমলারই নির্দেশে প্রাণ দেওয়ার সংকল্প করিতে পারে ও তাহার ইঙ্গিত মাত্রেই ফিরিয়া আসে, তাহাই দেখিয়া কাহিনীর একেবারে শেষের দিকে এক সময়ে নিখিল বলিতেছে "...বুঝলুম এখানে আমার দরকার নেই, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।...কাউকে তো মরার পথ থেকে ফেরাতে পারি নে, যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার, আমরা নিবানো, আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে

যাইতেছে, সেই জন্য তাহাকে প্রতি মুহূর্তে নূতন করিয়া চিনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কি বিমলা কি নিখিলেশ কেহই কাহাকেও প্রতি মুহূর্তে চিনিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে চিনিতে প্রস্তুত না থাকিলে নয় বৎসর একত্র বিবাহিত জীবন যাপন করিয়াও যে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকে প্রত্যেককে কত অল্প চেনে, সন্দীপ সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য করিয়াছে। বিমলা মনে করিত স্বামীকে সে খুব ভাল করিয়াই চেনে। তাই মাতৃপূজা প্রচলন ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া সে খুব ভাল করিয়া বিশ্বাস করিল এবং সে কথা সন্দীপকেও শুনাইয়া দিল— "এতো আর কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এত বড় সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোন আপত্তি হবে না।" সন্দীপ তখন বলিতেছে—"আমি মনে মনে হাসলুম, যারা ন-বছর দিন রাত্তির এক সঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে, কেবল ঘর-করনার কথাটুকুতেই চেনে—ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন আর থই পায় না—। ওরা ন-বছর ধরে বসে বসে এই কথাটা ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই, আজ ওরা বুঝতে পারছে কোন দিন যে দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কী করে"। ঘরে মিলিলেই যে বাহিরে মেলা হয় না তাহার কারণ ঘরের ঘটনা ও বাহিরের ঘটনা একই রকম নয়—ঘটনা পৃথক হওয়ার দরুণ তাহাদের পৃথক মূল্য রহিয়াছে। সেই জন্য তাহাদের পৃথক ভাবেই জানিতে হয়, বুঝিতে হয়। এই জন্য ঘর এবং বাহির উভয়ত্রই প্রতি মানুষকে বিচরণ করিতে হয়।

নিখিল ও বিমলার এতদিন ঘর ও বাহির একত্র যাপিত হয় নাই, আজ হঠাৎ মিলিবে কি করিয়া ? নিখিল অবশ্য যুক্তিতে জানিত যে তাহাদের পরস্পরের পরিচয় পরস্পর এখনও পূরাপূরি জানেনা কিন্তু সেও বিমলাকে অনেকটা নিজের মত করিয়া লইয়াছিল। আর মূঢ় বিমলা তো খুব দৃঢ় ভাবেই বিশ্বাস করিত যে, কি নিখিলের কি নিজের তাহার কাছে কোন পরিচয়ই আর বাকি নাই। এই দিক দিয়াও তাহাদের প্রত্যেকের জীবনে ফাঁকের স্থষ্টি হইয়াছিল।

এই ফাঁক স্থষ্টি হওয়া ব্যাপারে নিখিলেশ সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলিতে হইবে। নিখিল বস্তুকে তাহার স্বরূপে দেখিতে জানিত না। কি বিশ্বের অপর বস্তুর বেলায়, কি বিমলার বেলায় সে নিজেরই মনের রঙে সবটা রাঙাইয়া লইয়াছিল। বিমলার ভালবাসায় সে কি ভাবে নিজের মনের রঙ মিশাইয়া কিরূপ অনর্থের স্থষ্টি করিয়াছিল তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিব। বিশ্বের অপর বস্তুকেও সে তাহার যথার্থ মূল্যে দেখিতে জানিত না। বস্তুকে জানিতে হইলে, তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে যে বস্তুর মূল্যে বস্তুকে দেখিতে হয়, বস্তু-তন্ত্র হইয়াই বস্তুকে পাইতে হয়, একথা নিখিল অনেক পরে জানিতে পারিয়াছিল। কর্তৃতন্ত্র হইয়া আমারই ইচ্ছা দ্বারা তাহাকে আবৃত করিতে চাহিলে সমস্ত বিকৃত হইয়া জীবনে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহা জীবনকে যে শুধু রক্তাক্ত করে তাহা নয়, বস্তুকেও তাহার স্বতন্ত্র মূল্য হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইহার মধ্য দিয়াও নিখিলের জীবনে একটি ফাঁকের স্থষ্টি হইয়াছিল।

এই কথাটাই প্রমাণ হলো—আমার সাজানো বাতি জ্বল্‌ল না।” সেই নিবানো অঙ্গারের দীপ্তিহীনতার বাহিরেও যে জগৎ আছে তাহারই সংস্পর্শ তাই বিমলাকে উজ্জ্বল করিতে পারিয়াছিল। এই উক্তির ভিতর দিয়া নিখিলের সেই প্রকাশ-হীন দীপ্তিহীন গভীরতারই শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। এই যে অবস্থাটি—ইহা একদিকে নিখিলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং জীবনের সমগ্রতার পরিমাপে ইহা তাহার জীবনের একটা বিশেষ অভাবও সূচিত করে। সেই অভাবের মধ্য দিয়া তাহার জীবনে একটি মস্ত ফাঁকের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই ফাঁক, সেই ছিদ্র ছিল বলিয়াই বিমলার জীবনে সন্দীপের প্রবেশ সম্ভব হইয়াছিল।

পূর্বে দেখিয়াছি নিখিলের জীবন-জিজ্ঞাসা বা আত্ম-জিজ্ঞাসা বিমলার ছিল না। নিখিল যখন নিজের জীবনের সকল তপস্যার মধ্যে বিমলাকে চাহিত, তখন সেই চাওয়া বিমলার মনে কোন রেখাঙ্কন করিত না। পরের জন্য ভাবিয়া খাটিয়া জীবনটাকে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিবার কোন বাসনা বিমলার নাই। তাই তো নিখিলকে বলিতে হয় গরিবের ঘর হইতে আসিলেও বিমলা রাণী। অপর দিকে বিমলার প্রকৃতিকে বলা যায় ঠিক নারী প্রকৃতি। প্রাণের আবেগে সে চলে, বিচার করিয়া একেবারেই দেখে না; জীবনের সবটুকুর সাথে মিলাইয়া অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে সামঞ্জস্য করিয়া চলা বিমলার প্রকৃতিতে একেবারেই নাই। সে যখন নিখিলের কেন্দ্র হইতে দূরে দ্রুত ছিটকাইয়া পড়িতেছিল, তখন সমস্ত সংসারের মধ্যে নিখিল-বিরহিত বিমলার স্থান কোথায় ও কিরূপ তাহা তাহার বিবেচনায়

একবারও আসে নাই। ইহা ছাড়া সে সমস্তক্ষণ কেবল নিজের চিন্তা করিয়াছে—কিন্তু যে-নিখিল তাহাকেই দিনরাত্রি প্রদক্ষিণ করিত, বিমলার আজিকার চলায় সেই নিখিলের মনস্তত্ত্ব কিরূপ হইতে পারে, সে কথা একবারও তাহার মনে আসে নাই। সে যেমনই চলুক না কেন নিখিল চিরদিনই সেই পূর্বের নিখিলই থাকিয়া যাইবে—বিমলার এইরূপ একটি ভাব ছিল। কিন্তু যখন সে তাহার প্রতি নিখিলের চিরাভ্যস্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম দেখিল, তখন সেই ব্যতিক্রম কিভাবে তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল তাহা আমরা পরে দেখিয়াছি। বিমলা ভাঙ্গনের আনন্দে ছুটিয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে সে কথা ভাবিবার জন্য থামে না; কিংবা একেবারে তলাইয়া যাইবে বুঝিলেও তাহার ফিরিয়া আসিবার শক্তি থাকে না; ফিরিয়া আসিতেও চাহে না। বিমলা বিচার করিয়া একেবারেই দেখে না, একথাও সত্য নহে, বিচারও সে কিছু করে, কিন্তু অন্ধ প্রকৃতিকেই সকলের অপেক্ষা বড় স্থান দেয় বা না দিয়া পারে না। বিমলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিখিল ও সন্দীপ অল্প দুই চারিটি মন্তব্যে সুন্দর প্রকাশ করিয়াছে। সন্দীপ তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছে—"যে-জিনিস এ আগুনকে সামলাতে পারে, সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই।" যে-মেয়েদের সে বালাই নেই, আছে শুধু আবেগ আর চলা—বিমলা সেই জাতের মেয়ে। সংসারের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের প্রত্যেক অবস্থাকে একটি বৃহত্তর দৃষ্টি লইয়া চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া না দেখার ফলে জীবনের সমগ্রতা যায় হারাইয়া, তাহাতে জীবনের কোন

একদিকে চাপ পড়ে আবার কোন একদিক থাকে একেবারেই দৃষ্টির বাহিরে। নিখিলেশ বিমলার সম্বন্ধে বলিয়াছে যে—সে "প্রাণের বেগে একেবারে ভরা"। বিমলা একদিকে অতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ; প্রাণের বেগ ও আইডিয়ালকে যদি সে জীবনে সমন্বিত করিতে পারিত, তবে জীবন এমন ধারা রক্তাক্ত হইত না। নিখিলেশ ও বিমলা এবং পরে সন্দীপের জীবনেও যে সত্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এই—"Half truth is its own Nemesis. One-sided dogmatism has the opposite dogmatism latent in itself", জীবনের যে কোন একটি দিককে—সে আদর্শই হউক অথবা প্রাণের আবেগই হউক—একান্ত করিয়া ধরিলে জীবন তিক্ত হইবেই। তাই বিমলার জীবনেও ফাঁক আসিয়া গিয়াছিল। নিখিলের জীবনে ফাঁক সৃষ্টি হইয়াছিল এক কারণে, বিমলার জীবনে হইয়াছিল অন্য কারণে। জীবনে এই যে omission গুলি—একটা গোটা মানবতার পক্ষে এই যে ত্রুটিগুলি, ফাঁকগুলি—এই গুলির মধ্য দিয়াই জীবনের সংঘর্ষ, মোহ বা প্রলোভন ও অভিশাপ আসিয়া থাকে। ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"এ পাইব। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়াছে, দুষ্মন্তের চিন্তা শকুন্তলার সমস্ত ক্ষণকে অধিকার করিয়া আছে। অবস্থা এমন হইয়াছে যে আশ্রমে অতিথি আসিয়া ডাকিতেছেন—সে ডাকও শকুন্তলার কানে প্রবেশ করিল না। এই যে একের ধ্যানে অপরকে—স্বেচ্ছায় না হউক, স্থান না দেওয়ার অবস্থা ঘটিয়া থাকে—সেই পথ দিয়াই নামিয়া আসে জীবনে অভিশাপ—দুর্বাসার অভিশাপের ইহাই

তাৎপর্য। শকুন্তলার জীবনে দুষ্মন্ত যতটা সত্য—অতিথি দুর্বাসা যদি তাহার যথাস্থানে ততখানি সত্য হইতে পারিত, তবে তাহার জীবনে এ দুর্ভোগ লেখা থাকিত না। এমন কি ভগবানের ধ্যানেও এ বিশ্বের কোন আহ্বানকে অস্বীকার করা যাইবে না। কেন না বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুটিরই একটি স্বতন্ত্র ও সত্য মূল্য আছে। কোন 'একটি' বস্তুকে হয়তো অগ্রাহ্য করিয়া সারিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু বা ঘটনা পুঞ্জকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। এ বিশ্বে বস্তুর ধর্মই ইহা। তাই জীবনের এই ফাঁকগুলি বড়ই সাজ্ঘাতিক। মানুষ বাস্তবকে স্বীকার করিতে সাহস পায়না, যতটা পারে তাহাকে অস্বীকার করিয়া, ঢাকা দিয়া, চাপা দিয়া কাজ করিতে চায়। কিন্তু বস্তু তো সে জন্য অস্বীকৃত হয় না,—সে তাহার নিজের কাজ করিয়া যাইবেই। তাই তো সে চুপি চুপি গা ঢাকা দিয়া সাপের মতো মানুষের জীবন-স্বর্গোদ্যানে লুকাইয়া প্রবেশ করে ;—তারপর যখন সে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করে তখন বিস্মিত মানুষ বস্তুর শক্তির নিকট পরাজিত হয়। বিমলার জীবনে এইরূপ ফাঁক ছিল বলিয়াই সন্দীপের প্রবেশ সম্ভব হইয়াছিল।

কোন দিকে এইরূপ অতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পড়ার ফাঁক ছাড়াও নিখিলেশ ও বিমলার জীবনে আরও কতকগুলি ফাঁক ছিল। প্রতিটি বস্তু সংসারে এমন আশ্চর্য রকমে ঘটিত যে যদিও মানুষ অনেক জ্ঞানের দাবি করে, তবু এমন কেহ নাই যে অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারে যে একটি তৃণকেও সে পূরাপূরি জানিতে পারিয়াছে —একটি মানুষকে জানা তো দূরের কথা। এবং মানুষ বস্তুটি যেহেতু সচেতন ও সচল পদার্থ, সে যেহেতু প্রতি মুহূর্তেই বহিয়া

সন্দীপ

নিখিলেশ-বিমলার এইরূপ দাম্পত্য-জীবনে নয়টি বৎসর গলাইয়া গেল। ইহার পর সন্দীপের প্রবেশ। নয় বৎসরের বিবাহিত জীবনের কোন্ কোন্ ফাঁকের মধ্য দিয়া সন্দীপ প্রবেশ করিল তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। সন্দীপ আসিল—সে উলঙ্গ বস্তুতন্ত্রের রূপ নিখিলের প্রেমবলভীতে আদরে মুদিত অথচ প্রাণাবেগে পরিপূর্ণ বিমলাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। বিমলা এমনই এক অবস্থার মধ্যে পড়িল—যাহার ভীষণ মধুর রূপের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া সে পারিল না। প্রাণের স্পন্দনে ভরপুর সন্দীপ জীবন্ত মানুষ। তাহার প্রত্যেক কর্মে, প্রত্যেক বাক্যে—প্রাণবাণ সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দর্শনেই বিমলার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে অভিভূত করার দুর্লভ ক্ষমতা তাহার প্রচুর। সন্দীপ বলিয়াছে—"আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গবাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙ্গে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাবো, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতেই ছাড়ব না, মাঝখানে যা কিছু

আছে, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডব নৃত্য—তারপরে মরণ বাঁচন ভালোমন্দ, সুখ দুঃখ তুচ্ছ, তুচ্ছ, তুচ্ছ—।" সন্দীপ গতির, চলার মূর্ত প্রতীক। সে আর কিছুই বুঝে না, কিছুই জানে না, জানে শুধু সমস্ত ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া চলা—সেই চলার পথে তথাকথিত ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্য কিছুরই আর তত্ত্ব লইবার সে প্রয়োজন বোধ করে না। আমরা যাহাকে পাপ বলি তাহাকে সকলের সামনে দৃপ্ত বচনে সম্বোধন করিয়া সে বলে—

"এস পাপ এস সুন্দরী
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চরি।"

—পাপকে সে পাপ হিসাবেই গ্রহণ করে, অন্যায় হিসাবেই গ্রহণ করে, এবং অন্যায় হিসাবেই স্বীকার করে। পাপ, অন্যায়, জবরদস্তি—সব কিছুরই সে জয়গান গাহিয়া ফিরে। ধ্বংসকে সে ধ্বংস হিসাবেই উপভোগ করিবে। এক কথায় বস্তুকে, বাস্তবকে সে বাহির হইতে যেভাবে যতটুকু দেখিতে পায় ততটুকুই স্বীকার করিবে, সে যতটুকু দেখিতে পারিল তাহার বাহিরেও যে বস্তুর আরও রূপ আছে, অবস্থা আছে—যাহাকে বস্তুর "পর" অবস্থা বলা যাইতে পারে, তাহার কোন তত্ত্ব লইতে সে রাজী নয়। বাস্তবকে সে কেবল বর্তমান বলিয়াই মানে, কালের আর দুইটি অবস্থাকে সে স্বীকার করে না। রাষ্ট্র-যজ্ঞে মিথ্যা বুলির মসলা দিয়া পলিটিক্সের খিচুড়ি পাকান, বাহিরের বস্তুকে স্তূপাকার করিয়া তোলা—অন্যায়ের তপস্যাকে প্রচার করা—ইহাই সন্দীপ,—ইহাই সন্দীপের চরম লক্ষ্য। সে বলে "অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা, সে

সন্দীপ

নিখিলেশ-বিমলার এইরূপ দাম্পত্য-জীবনে নয়টি বৎসর গলাইয়া গেল। ইহার পর সন্দীপের প্রবেশ। নয় বৎসরের বিবাহিত জীবনের কোন্ কোন্ ফাঁকের মধ্য দিয়া সন্দীপ প্রবেশ করিল তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। সন্দীপ আসিল—সে উলঙ্গ বস্তুতন্ত্রের রূপ নিখিলের প্রেমবলভীতে আদরে মুদিত অথচ প্রাণাবেগে পরিপূর্ণ বিমলাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। বিমলা এমনই এক অবস্থার মধ্যে পড়িল— যাহার ভীষণ মধুর রূপের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া সে পারিল না। প্রাণের স্পন্দনে ভরপুর সন্দীপ জীবন্ত মানুষ। তাহার প্রত্যেক কর্মে, প্রত্যেক বাক্যে—প্রাণবাণ সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দর্শনেই বিমলার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে অভিভূত করার দুর্লভ ক্ষমতা তাহার প্রচুর। সন্দীপ বলিয়াছে—"আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গবাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙ্গে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাবো, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতেই ছাড়ব না, মাঝখানে যা কিছু

আছে, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডব নৃত্য— তারপরে মরণ বাঁচন ভালোমন্দ, সুখ দুঃখ তুচ্ছ, তুচ্ছ, তুচ্ছ—।" সন্দীপ গতির, চলার মূর্ত প্রতীক। সে আর কিছুই বুঝে না, কিছুই জানে না, জানে শুধু সমস্ত ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া চলা—সেই চলার পথে তথাকথিত ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্য কিছুরই আর তত্ত্ব লইবার সে প্রয়োজন বোধ করে না। আমরা যাহাকে পাপ বলি তাহাকে সকলের সামনে দৃপ্ত বচনে সম্বোধন করিয়া সে বলে—

"এস পাপ এস সুন্দরী
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চরি।"

—পাপকে সে পাপ হিসাবেই গ্রহণ করে, অন্যায় হিসাবেই গ্রহণ করে, এবং অন্যায় হিসাবেই স্বীকার করে। পাপ, অন্যায়, জবরদস্তি— সব কিছুরই সে জয়গান গাহিয়া ফিরে। ধ্বংসকে সে ধ্বংস হিসাবেই উপভোগ করিবে। এক কথায় বস্তুকে, বাস্তবকে সে বাহির হইতে যেভাবে যতটুকু দেখিতে পায় ততটুকুই স্বীকার করিবে, সে যতটুকু দেখিতে পারিল তাহার বাহিরেও যে বস্তুর আরও রূপ আছে, অবস্থা আছে—যাহাকে বস্তুর "পর" অবস্থা বলা যাইতে পারে, তাহার কোন তত্ত্ব লইতে সে রাজী নয়। বাস্তবকে সে কেবল বর্তমান বলিয়াই মানে, কালের আর দুইটি অবস্থাকে সে স্বীকার করে না। রাষ্ট্র-যজ্ঞে মিথ্যা বুলির মসলা দিয়া পলিটিক্সের খিচুড়ি পাকান, বাহিরের বস্তুকে স্তূপাকার করিয়া তোলা—অন্যায়ের তপস্যাকে প্রচার করা—ইহাই সন্দীপ,—ইহাই সন্দীপের চরম লক্ষ্য। সে বলে "অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা, সে

যখনই দগ্ধ না করে, তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোন জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয়, তখনই পৃথিবীর ভাঙ্গা কুলোয় তার গতি।” নিখিলের মত লোকের মুখে সন্দীপের পরিচয় এইরূপ—“…চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে, আরও করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি নে।” নিখিলের মাষ্টারমহাশয় চন্দ্রনাথবাবু যে সন্দীপকে পছন্দ করিতেন তাহা নয় কিন্তু তিনি সন্দীপ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা এই—“সন্দীপ অধার্ম্মিক নয়, ও বিধার্ম্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ, চাঁদই বটে। কিন্তু ঘটনা-চক্রে পূর্ণিমার উল্টোদিকে গিয়ে পড়েছে।” নিখিলকে চন্দ্রনাথ-বাবু বলিতেছেন “……ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে।” এমন বলা হইয়াছে যে সন্দীপের চরিত্রে কবি ইউরোপীয় জড়বাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। সন্দীপের চরিত্রে এই জড়বাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতার একটা রূপ আঁকিয়া রবীন্দ্রনাথ one-sided dogmatism যে সার্থক নয়, শোভন নয়, পরিপূর্ণ নয়—তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

সন্দীপের কি গোটাটাই একেবারে অস্বীকার করা যায়? সে যে-উগ্র বস্তু-তান্ত্রিকতা প্রচার করিয়া বেড়ায়, তাহা কি সত্য? গতির এই রূপ কি স্বরূপতঃ মিথ্যা? তাহা নয়। কিন্তু এই জগতের ধর্মই এই যে এখানে কোন কিছুকেই একান্ত করিয়া তুলিতে পারা যাইবে না। একান্ত গতি, একান্ত বস্তুতন্ত্রতা, একান্ত জড়বাদই মিথ্যা; গতি, বস্তুতন্ত্রতা বা জড়বাদ মিথ্যা নয়।

একান্ত স্থিতি, একান্ত আদর্শবাদ, একান্ত অজড়বাদও বাস্তবে টিকে নাই—যদিও অনেকের মস্তিস্কে তাহা আজও টিকিয়া আছে—টিকে নাই, টিকিতে পারে না ; আধুনিক জগতের একান্ত জড়বাদও টিকিবে না, টিকিতেছে না। একথা প্রমাণ করিবার পক্ষে ইহাই একমাত্র উত্তর নয় যে ইতিহাস এখনও শেষ হইয়া যায় নাই। জগত ও জীবনকে বিশ্লেষণ করিলে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে যেমন ইহা স্পষ্টই ধরা পড়ে যে কোন কিছুই এই জীবনের ক্ষেত্রে একান্ত নহে, তেমনি বাস্তবেও তো দেখিতে পাই নিজেরই চলার শ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মানুষ আদর্শবাদকে চাহিতেছে—কিন্তু কোন্ আদর্শকে যে জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাই শুধু বুঝিতে পারিতেছে না। এই বিশ্বে জড় ও চৈতন্য, জড়বাদ ও আদর্শবাদ প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র মূল্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকে প্রত্যেককে স্বীকার করিয়া একটি সমন্বিত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। উলঙ্গ বস্তুতান্ত্রিক সন্দীপকেও সে কথা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহার জীবনও তাই শেষে একটা 'কিন্তুতে' আসিয়া ঠেকিয়া গেল—ভরা তরী তীরে আসিয়া ডুবিতে বাধ্য হইল। সে স্বীকার করিতেছে—"আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করেছি, আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই, তা তো নয়, আমি যা ভালবাসিনে, যা ইচ্ছে করিনে, আমি যে তাও…।" বজ্র নির্ঘোষে অন্যায়ের জয়গান গাহিয়া তাহার পরেই সে বলিতে বাধ্য হইতেছে—"যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে সে নেহাৎ কাঁচা, অতি নরম……।"

স্বীকৃতি ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার পরেই আছে—"বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই যে এতটা অধ্যায় জমে উঠেছে, এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোন বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে, কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে, সেইটির সঙ্গে—আমার মতলবের সম্পূর্ণ মিল থাকে না। এই জন্যে তাকে চেপে-চুপে ঢেকেঢুকে রাখতে চাই নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।" এইখানে সন্দীপের মধ্যেও বাস্তবকে স্বীকার না করিবার সেই মনোবৃত্তি রহিয়াছে। কেননা সে দেখিতে পাইতেছে যে-কথাটা সে গলা ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে চায়, তাহার যে-মতবাদকে সে তাহার জীবনে প্রমাণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক, সেই মতবাদকে ছাপাইয়া তাহার বিরুদ্ধেই যে তাহার নিজের বুদ্ধির ফাঁক দিয়াই কথা উঠিতে চায়। কিন্তু তাহা হইলে যে তাহার আজীবনের সাধনা নষ্ট হইতে বসে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে অস্বীকার করিয়া পারা যায় ততক্ষণই মঙ্গল। কোন একটিমাত্র বস্তু বিষয় বা ভাবকে একান্ত করিয়া ধরা যে জীবনের ধর্ম নয়, জীবন যে সব কিছুকে লইয়া এবং সব কিছুকে ছাড়াইয়াও ব্যাপ্ত থাকে—সন্দীপের জবানীতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাইব। "যে একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই, জীবন তাহাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিটকে পড়ে। এবার আমি যেন বেশি দূরে ছিটকে পড়েছি।" সন্দীপ মনে করিয়াছিল সে ঝড়ের মত ছুটিয়া

চলিতে পারে ; ফুল ছিঁড়িয়া সে মাটিতে ফেলিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চলার ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু "এবার যে আমি ফুলের চারিদিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভ্রমরেরই মতো, ঝড়ের মতো নয়।" ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন 'ভ্রমরের মতো ঘুরিয়া বেড়ানো'টা জীবনেরই একটি ঘটনা, তাহাকে একেবারে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। তাহাকে তাহার যথার্থ মূল্য দিতেই হইবে। সন্দীপের ঝড়ের মত ছুটিয়া চলাটা যেমন সত্য, ভ্রমরের মত ঘুরিয়া বেড়ানটাও তেমনি সত্য। সেইজন্য সন্দীপের মত গতিবাদীর পক্ষেও স্থিতির এই খোঁচা নিঃশেষ করিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। অপর দিকটার সঙ্গে সমন্বিত করিয়া যতটুকু মূল্য সে পাইতে পারে তাহা তাহাকে দিতেই হইবে—তাহা না হইলে জীবনের উপর সে প্রতিশোধ তুলিবেই।

জীবনটাকে সন্দীপ বাস্তবের ঠাসবুনট করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আজ সে কী দেখিতেছে ?—"তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কি দেখছি ? কোথায় সেই ঠাসবুনানি ? এ যে জালের মতো—সূত্র বরাবর চলেছে—কিন্তু সূত্র যতখানি, ফাঁক তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। এই ফাঁকাটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোরের সঙ্গেই চলছিলুম—আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।" সন্দীপের কথাটা এই ছিল যে—"আমি চাই, হাতের কাছে এসেছে ছিঁড়ে নেব", খুব মোটা করিয়া পাইব, আমার সুখের জন্য তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিব—কিন্তু আজ কোথা হইতে 'বেদনা' আসিয়া জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। সে

বলিতেছে—"আমার খুশি আছে কিন্তু ব্যথাও আছে।" তারপর—"নিঃসঙ্কোচ বলের সঙ্গে নিশ্চতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দেই নি। এর থেকে বুঝতে পারছি এতদিন যে-সব বাঁধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।" যে-গতির উচ্ছৃঙ্খল বেগকে সন্দীপ একমাত্র সত্য বলিয়া প্রচার করে, তাহারই বিপরীতধর্মী স্থিতির প্রবণতা যে সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যেই লুকাইয়া ছিল একথা সন্দীপ স্বীকার না করিয়া পারে নাই। কেননা নিজেকে নিজে সন্দীপ সহজে ফাঁকি দিত না। যদিও আমরা পূর্বে একবার দেখিয়াছি যে এই লুকানো খোঁচাটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে যখন প্রথম অবহিত হইল, তখন মনে ভাবিয়াছিল ইহাকে ঢাকা দিয়াই বুঝি চাপা দেওয়া যাইবে—কিন্তু একবার যখন সে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তখন তাহাকে আর অস্বীকার করিয়া চলিবার মত দুর্বুদ্ধি সন্দীপের ছিল না। সে যাহা কিছু করিত, জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াই করিত—নিজের এই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার জন্য বিধাতাকে সে নিজেই ধন্যবাদ দিয়াছে।

তাহারও পরে যেখানে বিমলাকে কাছে পাইবার সুযোগ সত্ত্বেও সন্দীপ লইতে পারিল না, সেখানে সন্দীপ বলিতেছে—"ভিতরে একটা সংকোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী? সে কোনো একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলিতে জড়ানো।"—এইভাবে দেখান গেল যদিও সন্দীপ প্রধানতঃ গতির, প্রাণের মূর্ত দেবতা, তথাপি একান্ত ভাবে গতি, জড়বাদ বা বস্তুতন্ত্রতা যে সত্য নয়, প্রকৃতির মধ্যেই যে গতি এবং স্থিতি এই দুইটির সম-অস্তিত্ব সত্য বা বাস্তব, তাহারও আভাস সন্দীপের চরিত্রের

মধ্যেই পাওয়া যায়, তাহার চরিত্রের মধ্য দিয়া স্তরে স্তরে সেই কথাটাই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। যে-মানুষ প্রাণ-মন-দেহ সমন্বিত নানা বিরুদ্ধতার সমষ্টি, তাহার জীবনে কোন একটিকেই একান্ত করিয়া তোলা চলিবেই না, প্রকৃতি বাধা দিবেই। জীবনে যে নিত্য নূতন আবেষ্টনের সঙ্গে ছুটিতে না পারিল, পুরাতনের সমস্ত জীর্ণ পাতাকে ঝড়ের বেগে উড়াইয়া লইয়া যে দৌড়াইতে না পারিল, পৃথিবীর ভাঙ্গা কুলায়ই তাহার গতি, একথা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু এইভাবে ছোটাই সম্ভব হইবে না যদি ইহার সঙ্গে স্থিতিরও যে একটা স্থান আছে, বাহিরের সঙ্গে সঙ্গে ঘরেরও যে প্রয়োজন আছে সে কথা স্বীকার করিয়া জীবনে তাহা মানিয়া না চলি। ছুটিবার জন্য অনন্ত পথের যেমন দরকার, আবার বিশ্রামের জন্য ঘরের নির্জনতাটুকু তেমনই প্রয়োজন,—'পাইনির' অনন্ত মরুভূমির সাথে সাথে 'পেয়েছির' মরুদ্যান থাকা বাস্তব প্রয়োজন—এই দুইটিকেই তুল্য মূল্য দিতে হইবে। এই দুইটাকে যে লোক জীবনে সমন্বিত করিতে পারিল সে-ই সার্থক জীবন যাপন করিল, সার্থকতার আর কোন মাপকাঠিই বৈচিত্রে পরিপূর্ণ এই জগতে চলে না। সন্দীপ যে জীবনে ফাঁক অনুভব করিয়াছিল, সে যে বুঝিতে পারিয়াছিল জীবনটা জালের মত, সূতার প্রত্যেক বুননের পাশে পাশেই ফাঁক আছে—সেইখানেই সন্দীপ জীবনে সার্থক। এই ফাঁক সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া সেইভাবে চলিতে পারিলেই জীবনকে সার্থক উপভোগ করা যায়,—তাহা হইলেই কেহ জীবনে ফাঁকিতে পড়ে না—ক্ষতি দুঃখ বেদনা তাহার

জীবনে যতই থাকুক না কেন। সন্দীপ যাহা অনুভব করিয়াছিল, অন্ধ গোঁড়ামির বশে তাহাকে অস্বীকার করে নাই, তাহাকে মানিয়াই লইয়াছিল, বিমলাকে সে তাই ছিঁড়িয়া নেয় নাই—কেন না সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল। তাই সে তাহার হৃৎপিণ্ডমালিণীকে বন্দনা করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারিয়াছিল। তাহাতেই যেমন বিমলার জীবন সহজ হইয়াছিল, তেমনি সে শান্তও হইতে পারিয়াছিল। তিনটি প্রাণীকে কেন্দ্র করিয়া যে ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা তিনজনকেই পরিবর্তিত করিয়া বৃহত্তর স্তরে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। সন্দীপের জীবনে সে-কথার প্রমাণ পাইলাম। সন্দীপের সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন শুধু বিদ্যুতের মত তাহার চমকপ্রদ গতি, তাহাতে চোখ ঝলসিয়া যায়, প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে, বুকের মধ্যে কেমন শিহরণ জাগে। তাহার পর শেষ পর্যন্ত সেই সন্দীপ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিলাম।

সন্দীপ সম্বন্ধে এইখানে আরও একটা কথা বলিবার আছে। সন্দীপ সঙ্গে আনিয়াছিল একটা বিরাট ক্ষেত্রের আহ্বান—সে আহ্বান দেশ-মাতৃকার। বিমলাকে সে এই ক্ষেত্রেই আহ্বান করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই—সে বৃন্তচ্যুত বা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। যত বড় পদমর্যাদার দাবি, একটা বিরাটের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যত বড় দাবি সে করিয়াছিল আসলে তত বড় জীবন তাহার ছিল না, কেননা গতিই তো জীবনের একমাত্র কথা নয়। এ দৃষ্টিতে সে যেমন বিমলাকে, তেমনি দেশকে প্রতারিত করিল সন্দেহ নাই এবং এই জন্যেই

সন্দীপকে স্বদেশী জুয়াচোর বলা হইয়া থাকে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে যে সন্দীপকে একজন স্বদেশী নেতা করিয়া তাহার চৌর্যবৃত্তি প্রদর্শন করাইয়া সমস্ত স্বাদেশিকতাকে ও তাহার নেতৃত্বকে অবমাননা করিবার ভার লইয়া রবীন্দ্রনাথ "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের মধ্যে সন্দীপ চরিত্রের অবতারণা করেন নাই। জীবনে যাহাকে আমরা পাপ বলি, সেই অন্যায়, জবরদস্তি প্রভৃতির পিছনে যে একটা গতিতত্ত্ব আছে, তাহাই দেখাইতে সন্দীপ চরিত্রের সৃষ্টি। জীবনে যাহাকে এতদিন "ভাল" বলিয়া আসিয়াছি তাহাই যে শেষ কথা নয়, শুধু স্থিতি-প্রধান আদর্শবাদই বাস্তব নয়, আরও একটা দিক—যেটাকে গতির দিক বলা যায়, তাহাও যে সঙ্গে সঙ্গে রহিয়া যাইতেছে—অথচ যাহাকে আমরা "তত্ত্বতঃ" স্বীকার করিতে পারিতেছি না—সেই দিকটাকে দেখাইবার জন্যই সন্দীপ চরিত্রের প্রয়োজন। এ প্রশ্ন করা হয় যে যদি স্বাদেশিকতাকে বিদ্রূপ করিবার কোন অভিসন্ধিই রবীন্দ্রনাথের না থাকে, তবে স্বাদেশিকতার সহিত সম্পর্কযুক্ত চরিত্র তিনি নিলেন কেন?—ইহার একমাত্র সহজ উত্তর এই যে cosmic life এ, বিশ্বরূপগত জীবনে, যেখানে গতি প্রধান—তাহার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র রাষ্ট্র। গতি-প্রধান চরিত্রই লেখকের প্রয়োজন, অতএব রাষ্ট্রগত জীবন আছে, এমন একটি চরিত্রই তো লইতে হইবে।

সন্দীপের মুখে এবং সন্দীপের সম্বন্ধেও আমরা এমন কতকগুলি অসঙ্কোচ বক্তব্য ও মন্তব্য শুনিতে পাই যাহাতে যেরূপ চিন্তাধারায় আমরা অভ্যস্ত তাহাতে একথা আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সন্দীপের জবানিতে এ সকল রবীন্দ্রনাথ

বলিতে পারেন কিরূপে ? প্রত্যেক সভ্য সমাজ ন্যায়ের উপরে, সত্যের উপরে নিজেদের সভ্যতা গড়িয়া থাকে ; আমরা সত্য শিব ও সুন্দরের উপাসক। রবীন্দ্রনাথ সেই সভ্য সমাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া "এস পাপ, এস সুন্দরী" বলিয়া পাপকে এমন অসংকোচ আহ্বান করেন কি করিয়া ? ইহার যৌক্তিকতা কোথায় ? আমরা সন্দীপের কয়েকটি বচন তুলিয়া সেগুলির একটু তত্ত্ব লইতে চেষ্টা করিব। আবার সন্দীপ সম্বন্ধে নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথবাবু যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও একটু বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

চন্দ্রনাথবাবু সন্দীপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "সন্দীপ অধার্ম্মিক নয় ও বিধার্ম্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ, চাঁদই বটে কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টোদিকে গিয়ে পড়েছে।"—এখানে দেখি সন্দীপের যে কোন ধর্ম নাই তাহা নহে, সে বুদ্ধি বিবেচনাহীন খেয়ালী নহে, তাহারও একটা ধর্ম আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম আমরা যাহাকে ধর্ম বলিয়া জানি সে-ধর্ম হইতে আলাদা, আমাদের বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্মই সন্দীপের, তাই সে বিধার্মিক। তাহার কাছে এতদিনের ধর্মাধর্ম, ভালমন্দ, পাপপুণ্যের ধারণা সব উল্টাইয়া গিয়াছে। সেও চাঁদ বটে, ধর্ম তাহারও আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু সে অমাবস্যার চাঁদ। স্থিতিপ্রধান মানুষের কাছে যাহা অজানার রাজ্য বলিয়া অন্ধকার অর্থাৎ যাহা গতির ক্ষেত্র, সেইখানে তাহার আলো ফুটিয়া উঠে ; উহাই তাহার ক্ষেত্র। কেন এমন হইল ? তাহার কারণ দীর্ঘদিন ধরিয়া জীবনের যে-ধর্মকে আমরা অস্বীকার করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহাই এতদিনকার অপমানের শোধ তুলিতেছে। সেই শোধ তুলিবার প্রচণ্ড আক্রোশে সে নিজের

পরিমাপ ভুলিয়া যাইয়া আবার চরম মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত সন্দীপ-চরিত্রে আমরা আরও পাইব।

সন্দীপ বলিতেছে "আজ আমাদের ধর্মাধর্ম বিচার বিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই?

এস পাপ এস সুন্দরী
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চরি
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক
নির্লাজ কালো কলুষ পঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ংকরী

—আজ ধিক সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না।"—অন্যায়ের এমন জয়গান সন্দীপ বহুস্থানে করিয়াছে। অন্যত্র আছে—"যে বড়ো, সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্যে ন্যায়, আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়।...১-কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হয়ে উঠতে পারে নইলে ১ এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চলত। আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি।...অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা, সে যখনই দগ্ধ না করে, তখনই ছাই হয়ে যায়।"—এইভাবে সন্দীপ যে অন্যায়ের তপস্যাকে প্রচার করে তাহার ভিতরকার কথাটি কি?

প্রচলিত ধর্মাধর্ম ন্যায় অন্যায়ের সমর্থক আমাদের জীবন চলে

এক খাতে আর আমাদের আদর্শের চিন্তা বহে অন্য খাতে। আমাদের বাস্তব জীবন আর আমাদের আদর্শ জীবন আরম্ভ হয় দুই দিক হইতে, চলেও দুইদিকে—কোনদিনই সে দুইটা মিলিয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু আমাদের সাধনা যেহেতু থাকে আদর্শের দিকে, তাই দুই স্রোতের টানে পড়িয়া আমাদের জীবনটা শুধু রক্তাক্তই হয়। বাস্তবের টানে যাহারা আদর্শকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা জীবনে ধর্ম ঈশ্বর প্রভৃতিকে তার স্বরে অস্বীকার করিতে থাকে ; আবার আদর্শের খোঁচাটাও যাহারা কোনমতেই মুছিয়া ফেলিতে পারে না, দুইদিক জ্বলন্ত কাঠির মাঝখানের পোকার মত তাহাদের দেহ ও আত্মা শুধু পীড়িত হইতেই থাকে। তখনই নিখিলের সম্বন্ধে সন্দীপ যাহা বলিয়াছে সেই ভাষায় বলিতে হয়—"কী স্বদেশ, কী অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চায়—তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাঁধে—তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে ; কিছুতেই একথাটা ও মানতে চায় না যে কথা তৈরী হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরী হয়ে গেছে, কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে।" মানুষের আদর্শ যখন জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন এমন করিয়াই কথা ও স্বভাবে কিছুতে মিলিতে চাহে না। দীর্ঘদিন ধরিয়া কথা বা আদর্শের চাপ স্বভাব বা জীবনের উপর পড়িতে পড়িতে উহা স্বরূপতঃই বিকৃত হইয়া যায়। আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে "যেটা সত্য সেটা ভালোও নয়, মন্দও নয়—সেটা সত্য—এইটেই হল বিজ্ঞান।" আমরা সত্যের এই বিজ্ঞানটুকু বিসর্জন দিয়া,

সত্যের পরিপূর্ণ ও সমগ্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া উহার একটি দিককেই আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। সেই সকল আদর্শ-বাদ, সেই সকল নীতিকথা আজ যখন কিছুতেই আর জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে মিলিতেছিল না তখন আমাদের বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় যে এ সকল নীতিকথা বিত্তালয়ে শিক্ষা করিয়া বিত্তালয়ের পরীক্ষার সাথেসাথেই সেইখানে সমাধিস্থ করিয়া আসিতে হয়। সেইজন্যই সন্দীপ নিখিলকে বলে যে নিখিল "জন্ম-স্কুল-বয়", কেননা আজও সে আদর্শের কথা বলে। আসলে 'বস্তুর' ধর্মের সঙ্গে মিলাইয়া আদর্শ রচিত হয় নাই বলিয়াই আদর্শকে আর 'বাস্তবের' সঙ্গে মিলান সম্ভব হইতেছে না। জীবনের আদর্শ জীবনকে ভিত্তি করিয়াই হইবে, ইহাই স্বাভাবিক ও সত্য এবং তাহা হইলেই তাহা "জীবনের" আদর্শ হইতে পারে। কিন্তু আমরা জীবনের ঘটনা বাদ দিয়া, একটা সমগ্র জীবনের সকল উপাদানের হিসাব না লইয়া আদর্শকে ক্রমেই কাল্পনিক করিয়া তুলিয়াছি; তাই আমাদের জীবন দ্বিখণ্ডিত হইয়া একটা বাস্তব জীবন ও একটা আদর্শ জীবন এই দুইভাগে পরিণত হইয়াছে। আমাদের লক্ষ্য অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদিকেই আমরা ধর্ম নাম দিয়া সেই আদর্শে ইহাদের বিপরীত বস্তুকে অধর্ম ও পাপ নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। এইভাবে যাহা কিছু স্থিতিধর্মী তাহাকেই চরম সম্মান দিয়া যাহা গতিধর্মী তাহাকেই অসম্মান করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই হিংসা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি যাহা কিছুকে আমরা অন্যায় অধর্ম অসত্য বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম, জটিলতাময় জীবনের মধ্যে

তাহারা অস্বীকৃত হয় নাই বরং সেখানে সকলকেই প্রয়োজন হয়। কেবল আমাদের বিচারের চাপে দীর্ঘদিন ধরিয়া পিষ্ট হইয়া, অসম্মান পাইয়া পাইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘদিন হইতে পাপ বলিয়া অভিহিত হইবার ফলে তাহারা অধিকতর পাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের অবিকৃত রূপটি আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাই আজ তাহাদের সেই বিকৃত রূপকেই বিকৃত নামে আহ্বান করিয়া বলিতে হয় "এস পাপ, এস সুন্দরী" ইত্যাদি। সন্দীপের সেই দৃপ্ত আহ্বান আমাদেরও অন্তরে বাজিয়া উঠে। একেবারেই অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া আজ তাহার বিকৃত রূপটিকে পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইতেছে। সন্দীপ জীবনের অন্যায় অধর্মকেই স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু জীবনেরই অপরদিক ন্যায়, ধর্ম ইত্যাদিকে স্বীকার করিতে পারে নাই বলিয়াই, তাহার জীবন স্থিতির সঙ্গে সুন্দরভাবে সমন্বিত ছিল না বলিয়াই তাহার মধ্যে আমরা গতির এই বিকৃত রূপটিকে উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইব।

সন্দীপের আর একটি কথা—"যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি, সেইটে যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনাআপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়, দেশকে যেদিন লুট করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।"

সন্দীপের এই উক্তির মধ্যে সৃষ্টির একটি দিক, বীরের একটি

বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কাড়িয়া লওয়া জীবনের গতির একটি দিক, সেই দিকটিকেই সে প্রকাশ করিতেছে। "আমার ভাগে আসিয়া পড়িয়াছে"—ইহার অর্থ কি? যেদিন আমার অংশ ভাগ হইয়াছিল সেদিন কে বা কাহারা সে ভাগ করিয়াছিল? ভাগ করার সময় তাহারা আমার কথা কতটুকু কিভাবে বিবেচনা করিয়াছিল? আমার অংশ ভাগ করার সময় আমি কি তাহার মধ্যে ছিলাম? সংসারে কেহই কাহাকেও হাতে তুলিয়া কিছু দেয় না; সমস্তই নিজের যোগ্যতায় নিজের সৃষ্টির মধ্য দিয়া অর্জন করিতে হয়, প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধতার মধ্য হইতে যেন কাড়িয়াই লইতে হয়। জগতের প্রকৃতিতে ওতপ্রোত নানা ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন অস্তিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করিতে হয়। নিজের যোগ্যতায় যাহা অর্জন করিতে পারিব, তাহাই আমার; প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে যে জয়ী হইতে পারিবে, সেই বিজয়ী। দেশের দৃষ্টান্তে সে কথাটা সন্দীপ স্পষ্টই বলিয়াছে। দেশে জন্মিয়াও যে তাহা নিজেদের হয় না, ইহাকে নিজের বলিয়া পরিচয় দিবার যে কোন অর্থ ই হয় না, এ সত্য আমরা প্রতিদিনই বুঝিতেছি। মানুষ প্রথমে পায় কিংবা পাইয়াই থাকে কিন্তু সেইরূপ পাওয়ায় ভূমার পূজারী মানুষের তৃপ্তি হয় না। জন্ম হইতেই অথবা অনায়াসেই যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পারে না। মানুষকে যে প্রতিমুহূর্তে নূতন করিয়া নব নব আস্বাদনের মধ্যেও পাইতে হয়। যাহাকে পাইয়াই আছি, তাহাকে সকল সত্তা দিয়া দেহ-মন-প্রাণ-আনন্দ-বিজ্ঞানের মধ্যে না পাইলে চরম পাওয়া বা সত্য পাওয়া হয় না। প্রতি জীবের

মধ্যে ভগবান আছেন, তাই জীব ভগবানকে পাইয়াই আছে। কিন্তু সেই পাওয়া পাওয়াই নয় যতক্ষণ জীব তাহার সকল সত্ত্বার মধ্যে ভগবানকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিয়া না পাইতেছে। তেমনি দেশে যখন জন্মিয়াছি, তখন দেশ আমি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতেই যদি তৃপ্ত থাকি, তবে নিজেকে দুর্বল অক্ষম ও ক্লীব ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যে কোন বস্তুকেই আমার করিতে হইলে এমন করিয়াই পাইতে হয়। তাহা হইলেই উহা বীরের পাওয়া, সক্ষমের পাওয়া হইল এবং তাহা হইলেই জগতে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব ও বাস্তব।

কাড়িয়া লইতে হইবে সন্দেহ নাই—উহা জীবনের এক দিক, কিন্তু সেইসাথে জীবনের অপরদিক—যাহাকে আমরা স্থিতির দিক বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছি—তাহার সঙ্গে সমযোগ না রাখিয়া কাড়িতে গেলে আবার ছন্দে ভুল হয়। সংসারে আমিই একমাত্র শক্তি নই, তাই একমাত্র নিজের জন্যই কাড়িতে গেলে তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিশ্বকে স্বীকার না করিয়া কেবল আমারই করিয়া লইতে গেলে বাধা আসিবেই। কেননা বিশ্বে আমি ও আমার কাড়িয়া লওয়া যেমন সত্য ও বাস্তব, তেমনই অপর প্রতিটি আমির পক্ষেও তাহা সম সত্য ও বাস্তব। তাই সর্বভূতের প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি বা সেবাবুদ্ধি বাদ দিয়া লইতে গেলে চলিবে না। ইহাই সার্থক দৃষ্টি। সন্দীপ ছিল গতিপ্রধান, এবং গতির একটি ধর্ম কাড়িয়া লওয়া। নিজের যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করাকেই শুধু সে স্বীকার করে, কিন্তু অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গেই ত্যাগও যে করিতে হয়—জীবনের এই অপর দিকটির সঙ্গে

তাহার পরিচয় ছিল না বলিয়াই কাড়িবার ছন্দে সে ভুল করে। তাই একদিন তাহারও জীবন কিস্তিতে আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছিল।

সন্দীপের আরও একটি কথা—"দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।"

আমরা মনে করিয়া থাকি সত্য বা ধর্ম চিরকালের মত স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে;—সেই আদিযুগে সত্য, ধর্ম, ন্যায় অন্যায় পাপপুণ্যের যে রূপ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহা অবিকৃত ও চিরন্তন। এবং ইহাদেরই আদর্শে দেবতার যে-মূর্তি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, আমরা শুধু যুগে যুগে তাহারই সাধনা করিয়া আসিব, চিরদিন তাহারই পূজারতির ঘণ্টায় দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিব। কিন্তু জীবনের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই সত্যাসত্য, ভালমন্দ, ধর্মাধর্ম কোন কিছুই চিরদিনের মত সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা absolute, এমন কথা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাই দেবতার সম্পর্কে মানুষের ধারণাও সেই সনাতনই থাকিবে, তাহাও হইতে পারে না। বার্গসঁ বলিয়াছেন—"God is not an already-made thing." কালস্রোতের অবিরাম গতির মধ্য দিয়া পরিবর্তন, কালোপযোগী পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কালকের ভাল আজকের ভাল নয়, কালকের মন্দ আজকের মন্দ নয়। মানুষ চায় প্রতি-মুহূর্তে নব নব আস্বাদন, নিজেকে পুরাতন হইতে দিতে তাহার অসীম প্রাণ কিছুতেই চায় না। তাহার জীবন যেমন বহিয়া যাইতেছে সেই সাথে জীবনের সম্পর্কে যত ভালমন্দ, সত্যাসত্য,

ধর্মাধর্মের ধারণা—সবই বহিয়া আসে। কালের সাথে সাথে সত্যকে সৃষ্টি করিয়া লইতে না পারিলে কালের কাছে সত্যের সেই পচাগলা পুরাতন রূপ লইয়া কালস্রোতে ভাসমান মানুষের চলে না। তাই তো যুগে যুগে দেবতাকে সৃষ্টি করিতে হয়, সত্যকে সৃষ্টি করিতে হয়। মানুষ নিত্য নূতন হইতে চাহিবে, অথচ তাহার দেবতার আদর্শ চিরদিন একই থাকিয়া যাইবে, তাহা হইতে পারে না। জীবনের সাথে সাথে জীবনের দেবতাকেও সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। সন্দীপ চলমান, তাই তাহার মুখে একথা শোভা পায় বটে।

নিখিলের নিকট সন্দীপের নিম্নলিখিত মন্তব্যটিও প্রণিধান-যোগ্য—"মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না, আর পৃথিবীর বারো-আনা-ভাগই ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে—মানুষ আপনাকে চেনে।"

সন্দীপ এই যে মোহের জয়গান করিল, ইহার অর্থ কি? আমরা জানি এবং ইহার পরেই নিখিলও বলিয়াছে যে মোহকে পরিত্যাগ করাই জীবনের স্বাভাবিক সাধনা। তবে সন্দীপের কথার অর্থ কি? মোহ না থাকিলে কোন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয় একথা এই অর্থে সত্য—মোহ অর্থ কোনও খণ্ড বিষয়কে সমগ্র করিয়া ধরিয়া তাহাতে একান্তভাবে আসক্ত হওয়া, যখন যাহা হাতে লইব তখন তাহাতেই সমগ্র মন নিবিষ্ট করা। এমন করিয়া কর্মের মধ্যে অনন্য হইতে পারিলেই কর্মসম্পাদন সম্ভব সহজ ও সার্থক হয়। যখন যাহা আমার নিকট বর্তমান তখন

তাহাতেই নিজের সমগ্র চেতনা নিয়োগ করিব বটে কিন্তু যদি একমাত্র উহাতেই আসক্ত হইয়া কার্যান্তরকে, ঘটনান্তরকে বা অন্য বস্তুকে প্রয়োজনমত ঠিক ততখানিই অনন্যতার সঙ্গে গ্রহণ করিতে না পারি, তবে তাহাতে আবার সমস্ত কাজ নষ্ট হইয়া জীবনের ছন্দে ভুল হইয়া যায়। জীবন তো একটা কাজ বা একটা ঘটনা লইয়া নহে ; জীবনের সংখ্যাহীন ঘটনার মধ্য দিয়া নিজেকে সমান যোগ্যতার সঙ্গে চালাইয়া লইতে হইবে এবং যখন যেটি প্রধান—সকল শক্তি লইয়া নিজেকে তাহাতে নিয়োগ করিতে হইবে। অথচ এই প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য হইতে একটি ঐক্য, একটি সমন্বয় বাহির করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি সন্দীপ ছিল একান্তভাবে গতি-প্রধান, তাই সে কোন বিষয়ে বিশেষভাবে আসক্ত হইয়া কর্ম করার কথাই জানে, কিন্তু সংখ্যাহীন ঘটনার প্রতিটির মধ্যে যে তন্ময় হইতে হয় অথচ তাহাদের মধ্যে যে একটি ঐক্যও বাহির করিয়া লইতে হয় একথা সন্দীপের জানা ছিল না। এবং তাহা করিলে যে অবস্থা লাভ হয়, তাহাই মোহ-মুক্তির অবস্থা। নিখিলের মত মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকেরা মোহকেই যত অনর্থের মূল স্থির করিয়া মোহমাত্রকেই দুষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছে। সন্দীপ জানে যে কোন বিষয়ে একান্তভাবে আসক্ত না হইলে, মানুষকে কোন বিষয়ে তন্ময় করিয়া দিতে না পারিলে কাজ হয় না, তাই সে আবার মোহকেই সমস্ত শক্তি দিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। পূর্ববর্তীদিগের আদর্শের চাপেই আজ আবার পরবর্তীদের দ্বারা মোহ বিকৃত হইতেছে।

নিখিলেশ বিমলার চরিত্র বৈশিষ্ট্যের আভাস দিয়া তাহাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম অঙ্ক আলোচনা করা গিয়াছে এবং সন্দীপের প্রবেশ কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, তাহাও বলা হইয়াছে। এইবার নিখিলেশ বিমলার জীবন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া তাহাদের জীবনের ক্রমপরিণতির ইতিহাস লক্ষ্য করা যাইতেছে।

নিখিলেশ

নিখিলের মধ্যে একটা জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু তাহার স্বরূপ বা প্রকৃতি তাহার নিকট স্পষ্ট ছিল না। সে ভালবাসিত খুবই সন্দেহ নাই, কিন্তু ভালবাসিবার ছন্দ সে জানিত না। তেমনই বিশ্বরূপগত একটা জীবন তাহার চিরদিনই ছিল বটে কিন্তু তাহাকে যথার্থ মূল্যে সে দেখে নাই। তাহার জীবনকে ক্রম বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে বৃহতের মধ্যে পাওয়ার একটা বেদনার আভাসই তাহার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে নিহিত ছিল। তারপর যখন একটা আঘাত তাহার এতদিনকার সত্যকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নের বেদনার মধ্যে ফেলিয়া দিল, তাহার প্রকৃতিগত জিজ্ঞাসা-প্রবণতা নিজের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া নিজেকে শত প্রশ্ন করিল। সে দেখিতে পাইল এতদিনকার সমস্ত জানাই ভুল হইয়া যাইতেছে, যাহাকে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, আজ তাহারও অন্তরের কত সুপ্তকথা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাওয়া বলিতে কি বুঝা যায় তাহার স্বরূপ কিছুটা হৃদয়াঙ্গম করিয়া সে এক সময়ে বলিতেছে—"একটা কথা তখন ভাবিনি। মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপেই দেখতে চাই তাহলে তার উপর একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়।" কেন এমন হইল একথা ভাবিতে ভাবিতে যুদ্ধ-পর্বের শেষের দিকে এই ব্যাপারটা যখন তাহার কাছে

পরিষ্কার করিয়া ধরা পড়িয়াছে তখন সে বলিতেছে—"আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুত করে ঢালাই করব, আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়⋯।" বিমলাকে নিখিল বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে-শক্তিতে-প্রেমে পরিপূর্ণ দেখিতে চাহিয়াছিল, ভালও সে বাসিত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে; কিন্তু ভালবাসার পাত্রের প্রকৃতির স্বরূপের পরিচয় লইয়া, তাহাকে তাহার স্বরূপেই সত্য রাখিয়াও যে প্রেমের মধ্য দিয়া তাহাকে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করান যাইতে পারে—এ সত্য তাহার জানা ছিল না। ইহা ছাড়া অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ অথচ উহারই মধ্যে একটি ঐক্যতানযুক্ত এই বিশ্বে পাওয়ার যে আর কোন অর্থই হয় না। কাহাকেও নিবিড় গভীরভাবে ভালবাসিতে হইলে তাহাকে যে বিস্তৃতভাবে ব্যাপকের মধ্যেও ভালবাসিতে হয়; তাহাকে যে নিজের কিংবা শাস্ত্রের কোন ইচ্ছার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া, বাঁধিয়া রাখিয়া ভালবাসা যায় না; নিজের ইচ্ছার মধ্যে মুক্তি দিয়াই ভালবাসিতে হয়—এই সত্য বা তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিবার জন্যই নিখিলের জীবনে ঝড়ের প্রচণ্ডতার প্রয়োজন ছিল। তাহার মত একটি আত্ম-জিজ্ঞাসু প্রাণকে পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে আনিবার জন্য ঝড়ের আবশ্যক হইয়াই থাকে, সে ঝড়ের রুদ্ররূপও নিখিলের জীবনে সুন্দর। এই সত্যগুলি নিখিল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, এবং কমবেশি আয়ত্তও করিয়াছিল। এজন্য তাহার মধ্যে স্থিতি-প্রধান চিন্তাধারার

যে "কাঠিন্য" (rigidity) ছিল, তাহা মুক্তির আলোকে ছাড়া পাইয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। "ছোট জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা" ঝড় উঠিবার আগে নিখিল-বিমলা-সন্দীপ তিনজনেই নিজ নিজ পরিচ্ছিন্ন সংস্কার বা প্রকৃতি লইয়া ছোট আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যে-ঝড় উঠিয়াছিল তাহা তিনজনকেই প্রবল আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। সন্দীপের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত খোঁচা কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা দেখিয়াছি ; এইবার নিখিলের পরিবর্তন দেখিব।

সন্দীপ নিখিলের বহুদিনের বন্ধু—উভয়ের মধ্যে মতের মিল নাই কিন্তু ছন্দের মিল আছে। যেদিন নিখিল-বিমলার দাম্পত্য-জীবনে সন্দীপ প্রবেশ করিল—সেদিনও তাহার সঙ্গে নিখিলের প্রীতির অভাব হয় নাই। নিখিল সবই বুঝিতেছিল, কিন্তু তাহার করিবার কিছু ছিল না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাঁক যদি আসিয়াই যায়, তাহা লইয়া আড়ম্বর করিয়া, দাপাদাপি করিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিয়া কী হইবে? সকল প্রকার স্নেহ বা প্রীতির সম্পর্কেই একথা সত্য। নিজের হৃদয়ের দুয়ার খোলা রাখিয়া কেবল নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় চিরকাল ধরিয়া অপেক্ষা করা ছাড়া করিবার আর কিছুই তো নাই। নিখিলও তাই করিয়াছে—সে বলিয়াছে বুকের মধ্যে নাড়ী টনটন করিয়া উঠে বটে, এতদিন ধরিয়া বিমলাকে এত ভালবাসা গিয়াছে বটে, সে স্ত্রী তাহাও সত্য বটে—কিন্তু তবু যদি সে বলে এ সকলের বাহিরেও তাহার

জীবন আছে—তবে একটি গোটা মানুষকে কি ঐ কথাকয়টির মধ্যে পূরিয়া রাখা যায়? বিমলা যদি বলে আমি শুধু স্ত্রী নই, আমি আমিই, আমি মানুষ—তখন সে স্ত্রী এই একটি সত্যকে স্বীকার করিয়া তাহার জীবনের অপর সত্যগুলিকে তো অস্বীকার করা যায় না। একটি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যতগুলি সত্য আছে প্রত্যেকটিই বাস্তব—তাই প্রত্যেকটিকেই স্বীকার করিতে হইবে। নিখিল যদি স্ত্রী এবং মানুষ—এই উভয় হিসাবেই বিমলার সকল সত্ত্বার পূর্ণ পরিতৃপ্তি দান করিতে পারিত, একমাত্র তাহা হইলেই তাহার বলিবার কিছু থাকিত না। নিখিলের মধ্যে যাহা বিমলা কোনদিন পায় নাই; যে-ক্ষুধার কোনও সচেতন বোধও তাহার পূর্বে ছিল না—সেই ক্ষুধা জাগিয়া উঠিলে তাহারই আস্বাদন যদি সে সন্দীপের মধ্যে পাইয়া সাড়া দেয়, নিখিল যদি বিমলাকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি, জীবনের সকল সত্ত্বার পূর্ণ সার্থকতা না দিয়া থাকে, তবে নিখিলের বলিবার কী আছে? মনস্তত্ত্বের বিচারে সমাজেরই বা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কী আছে? কিন্তু নয় বৎসর না হউক, একদিন একক্ষণের জন্য হইলেও নিখিলেশ বিমলা উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়াছিল, সে ভালবাসার মধ্যে অনেক ছিদ্রই ছিল বটে, উহা একটি সমগ্রতার স্তরে দাঁড়াইয়াও কৃত হয় নাই বটে তবু সে ঘটনাকেও জীবনে অস্বীকার তো কোনমতেই করা যাইবে না। তাই বিশ্বাস রাখিতেই হইবে, দুয়ার খোলা রাখিতেই হইবে। প্রথমাবধি নিজেকে, অপরকে এবং উভয়ের সম্পর্ককে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া না

দেখার জন্য, একটি সমগ্র জীবন যাপন না করার জন্য, প্রথম ডানা মেলিবার যে দাপট তাহা আজ সহ্য করিতেই হইবে, এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। তারপর যেদিন সকল ঝঞ্ঝাটের কলরব থামিয়া যাইবে এবং নিখিলও একটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবে সেইদিনকার বৃহৎ আকাশের মধ্যে দাঁড়াইয়া যদি নিখিল স্থান না পায়, তবেও সেদিন নিঃশব্দেই বিদায় হইয়া যাইবে। সেদিন যাহা সত্য তাহারই জয় হইবে। তাই নিখিল বলিল—"আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোট জায়গা থেকে বড়ো জায়াগায় যাবার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা ; ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশোনা সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবন-ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাই নে, তাহলে বুঝব এতদিন যা দিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে-ফাঁকিতে কোন দরকার নেই। সে দিন যদি আসে তো ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবরদস্তি? কিসের জন্য? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে?"—এই যে নিখিল বিমলাকে একটিমাত্র প্রশ্ন না করিয়া তাহার প্রতি কোন ঘৃণা, কোন বিদ্বেষভাব না রাখিয়া একটি বৃহৎ ও উদার অবকাশের সাথে সাথে তাহার হৃদয়ের দুয়ারও খোলা রাখিয়াছিল, সেই অবকাশের জন্যই বিমলা পুনরায়

ফিরিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এইখানেই নিখিলের কৃতিত্ব যে সে নিজেকেও পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল, মনের স্তব্ধতার কুয়াশার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া ফেলে নাই। তাই সে বলিতে পারিয়াছিল যে আজ যদি তাহার গলায় মালা নাই পড়ে, তবে বিধাতা তাহারই বিচার করিবেন, যে মালা দিল।...

ভালবাসার স্বরূপ তাহার কাছে কিভাবে বদলাইয়াছিল আমরা তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় যখন নিখিলের বুদ্ধি ও হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারগুলি একে একে খুলিয়া যাইতে লাগিল, তখন একদিন সে বুঝিতে পারিল কেন বুক-ভরা ভালবাসা ও একান্ত শুভবুদ্ধি লইয়াও বিমলাকে সে পাইতে পারে নাই। বিমলার প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় না লইয়া, ভালবাসার পাত্রকে তাহার মূল্যে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া আমারই শুভবুদ্ধিকে সীমাহীন করিয়া তুলিলেও যে তাহা অবাস্তবই হইয়া পড়ে। নিখিলের অতিরিক্ত অন্তর্মুখীণ হওয়া, তাহার জীবনে প্রাণাবেগ অপেক্ষাকৃত কম থাকা ইত্যাদিও যে এই না পাওয়ার কারণ তাহা পূর্বে দেখিয়াছি।

বিমলাকে নিখিল তাহার সাধনার মধ্যে পায় নাই। সে বিমলার প্রকৃতির স্বরূপের খোঁজ না লইয়া বিমলাকে নিজের মনের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল, নিজের মধ্যের যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র তাহা দিয়া বিমলাকে মুড়িয়া রাখিয়াছিল। অন্য ভাবে বলা যায় নিখিল নিখিলেরই রূপান্তরকে ভাল-বাসিয়াছিল ; তাহার স্ত্রী বমলা না হইয়া একটি কাঠের পুতুল

হইলেও বোধহয় সে এমনিই ভালবাসিত। ভালবাসার পাত্রের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষা ভালমন্দ কী—এককথায় তাহার প্রকৃতি কিরূপ—তাহার পরিচয় না লইয়া কেবল আমারই ভাললাগা মন্দলাগাকে, কেবল আমারই ইচ্ছাকে—সে ইচ্ছা শুভই হউক আর অশুভই হউক—ঘনায়িত করিয়া তুলিলে তাহাতে শুধু কুয়াশার বাষ্পজালই সৃষ্টি করে—কাহারও জীবনেরই প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমার জীবনের বাহিরেও যে তাহার জীবন আছে, সেও যে একটা গোটা মানুষ একথাটা মনে রাখিতেই হইবে। সে বস্তুতন্ত্র হইয়া ভালবাসে নাই, 'নিজের মত করিয়া' বিমলাকে ভালবাসিত। সেই 'নিজের মত করিয়া'র অবস্থা পৃথিবীর সমস্ত উৎকৃষ্ট পদার্থে পূর্ণ হইলেও চলিবে না। সেই উৎকর্ষের সঙ্গে অপর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক ও সহজ যোগ স্থাপিত না হইলে উহার কোন মূল্যই থাকিবে না। যে-মানসী বিমলাকে সে মনে মনে ভোগ করিত, তাহার সহিত বাহিরের বিমলার খুব বেশি যে মিল ছিল তাহা নয় এবং বিমলার প্রকৃতিগত অনৈক্য যে তাহার দৃষ্টিতে আসে নাই তাহাও নহে ; তবু সে একমাত্র ভরসায় ছিল যে ভাল যখন সে প্রাণ দিয়াই বাসে, কেন পারিবে না ? কিন্তু ভালবাসাই চরম কথা নয় ; ভালবাসার রকম বা কৌশল না জানিয়া শুধু ভালবাসিলেই তো চলিবে না। নিখিলের ভালবাসা বস্তুতন্ত্র না হওয়াতে তাহা যে অনেকখানিই তাহার মানসিক বিলাসমাত্র—একথা পূর্বে তাহার খেয়ালে আদৌ আসে নাই। সে তাহার মানসী বিমলাকে চাহিয়াছিল, নিজের ইচ্ছা ও কল্পনার মধ্যে

বিমলার যে রূপ অঙ্কিত ছিল, তাহাকেই দেখিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কাহারও পরিচ্ছিন্ন বাসনা এমনভাবে তৃপ্ত হইতে পারে না, কেননা বিমলারও যে একটা ইচ্ছা, একটা পৃথক সত্ত্বা ছিল। আঘাত যেদিন আসিল, আত্মজিজ্ঞাসু ও বিশ্লেষণক্ষম নিখিল সেদিন বলিতে পারিল—"আজ যেমন নিজেকে, তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখতে হবে। এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামী আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়েছিলুম। আমার মানসীমূর্ত্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।"—তাহাতে নিজেকেও সে সম্পূর্ণ দেখিতে পায় নাই, বিমলাকেও অস্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছিল। আঘাত পাইয়া বুঝিতে পারিল সত্যিকার ভালবাসিতে হইলে ভালবাসার ব্যক্তিকে তাহার যথার্থ মূল্য দিতে হইবে—আমার কোন ইচ্ছা বা দাবি দ্বারা তাহাকে পরিপূর্ণ আবৃত করা চলিবে না। সমস্ত রকম অধিকারের দাবিই তুলিয়া লইতে হয়—স্বামীত্বের দাবি, শুভাকাঙ্ক্ষার দাবি, এমনকি ভালবাসার দাবিও দাবি হিসাবে রাখা চলে না। বিশ্বের মধ্যে কাহাকেও জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত দেখিতে হইলে তাহার উপর একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখিবার আশা যে ছাড়িয়া দিতে হয় একথা নিখিল বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ভালবাসার দাবিও যে রাখা চলে না, যুদ্ধপর্বের মধ্য-অবস্থায় না আসিয়া সে কথা তার মনে আসে নাই—কেননা সে মনে করিয়াছিল স্বামীত্বের অহংকারই দোষনীয়, ভালবাসার

দাবি বোধ হয় মানুষের কোন অনিষ্ট করে না। পরে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে সর্বপ্রকার অধিকারের দাবি ছাড়িয়া দিলেই মানুষকে তাহার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপে দেখিতে পাওয়া সম্ভব। ভালবাসা কোন অনিষ্ট করে না বটে কিন্তু ভালবাসার বন্ধন অনিষ্ট করিয়াই থাকে! কেবল আমার ভালবাসার উদার বিস্তৃতির মধ্যে আমার ভালবাসার বাঁশি বাজাইয়া আমার ভাল-বাসার পাত্রকে আনন্দের অংশীদার করিব; তাহার নিজের বিচরণের পথ মুক্ত রাখিব, তাহার মধ্যে আমার কোন ইচ্ছাকে ফুটাইতে না চাহিয়া বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছাই তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে—এই আশা লইয়া চলিব। একমাত্র তাহা হইলেই মানুষকে পাওয়া সম্ভব হয়। এই কথাটা বুঝিতে নিখিলের পক্ষে ঝড়ের প্রয়োজন ছিল। এই কথাটা বুঝিতে পারিয়াই সে বলিল যে এতদিন তাহার ভালবাসার মধ্যে, তাহার ইচ্ছার মধ্যে একটা জবরদস্তি ছিল—হউক না সে জবরদস্তি আদর্শের, সুকঠিন ভালর—কিন্তু তাহাও তো একটা চাপ বটে। অপরের উপর তাহাও রাখা চলে না। সে যখন বিমলাকে বিমলার স্বরূপে দেখিতে পাইল, সে যখন নিজের ইচ্ছার জবরদস্তি হইতে বিমলাকে মুক্তি দিতে পারিল, সে যখন বিমলাকে ও নিজেকে সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেখিতে পাইল, তখনই সে চরম মুক্তি পাইল, তখনই সে বিমলাকে প্রকৃত পাওয়ার মত পাইল। সে বলিয়া উঠিল—"আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? তাহলে এবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোন আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না—কেবল

আমার ভালবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব—তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হ'ক, আমার ফরমাশ একেবারে চাপা পড়ুক—তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে, তারই জয় হ'ক, আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক্।"—পাওয়ার এই স্বরূপ হৃদয়াঙ্গম করিয়াই নিখিল নিজেকে জয় করিল, বস্তুকে আয়ত্ত করিল। ইহার পর যত দুঃখ আসুক না কেন তাহা সহ্য করা এইজন্যই সম্ভব হয় যে সে দুঃখ মোহের দ্বারা ক্লিষ্ট নয়। যখনই সে বিমলাকে অন্তরের মধ্যে সত্যিকারের পাওয়া পাইল, বাহিরের দিক হইতে পাইতেও তখন আর দেরি হয় নাই।

নিখিল যেদিন বুঝিতে পারিল যে বিমলার সঙ্গে তাহার সম্পর্কের ভিতরকার সুরটুকু বেসুরো হইয়া গিয়াছে, সেদিন হইতে এই কথাটিই তাহার মনে হইয়াছে যে যাহার শিকড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে কোন মতেই তাহা প্রকৃত হইবে না। ছন্দ হারাইয়া যাওয়ার জন্য অন্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক আজ মিথ্যা বলিয়া দেখা যাইতেছে, সেই মিথ্যাকেই আজ তাহার সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সে আমার সামাজিক স্ত্রী এই দাবিও যেমন উপস্থিত করা যাইবে না, তেমনি অন্তরের মধ্যে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বুকের মধ্যে নাড়ী যে টনটন করিয়া উঠে, বুকের সেই বেদনাকেও অাঁকড়াইয়া থাকা চলিবে না। আজ যাহা সত্য নয়, একদিন তাহা সত্য ছিল—এই অজুহাতে যদি তাহা অাঁকড়াইয়া রাখিতে চাই কিছুতেই পারিব না। সেই মিথ্যার বোঝা আরও ভয়ানক

হইয়া উঠিবে। আজকের সত্যকেই তাই আজ স্বীকার করিয়া অন্তরের মধ্যে শুধু নয়, বাহিরের দিক হইতেও তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে। তাই সে বার বার নিজের কাছে নিজে প্রার্থনা জানাইয়াছে—"কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে করে কারোই কিছু মঙ্গল নেই, সুখ তো নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও—দুঃখ বুকের মানিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার।" এইজন্য একদিন বাগানে দাঁড়াইয়া বিমলাকে সে অনায়াসেই বলিতে পারিল—"বিমলা, আমার এই পিঁজরের মধ্যে চারদিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্য এখানে ধরে রাখব? এমন করে তো তুমি বাঁচবে না।" "তোমাকে যদি এমন করে বেঁধে রাখি তাহলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোন সুখ আছে?"…"এই আমি তোমাকে সত্য বলছি—আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর কিছু না হতে পারি অন্ততঃ আমি তোমার হাতের হাতকড়া হব না।" এই মুক্তি দিয়া নিখিল নিজেই মুক্তি পাইল। এই মুক্তির বাঁধনেই যে মানুষকে সর্বাপেক্ষা কঠিন করিয়া বাঁধিতে পারা যায়—একথা নিখিল বুঝিতে পারিয়াছিল। নিখিল যখন বিমলাকে মুক্তি দিয়াছিল, তখন সে তো কোনরূপ ঘৃণা, বিদ্বেষ বা কোনরূপ আত্মসম্মানের বোধ হইতে মুক্তি দেয় নাই, হৃদয়ের দুয়ার সে খোলাই রাখিয়াছিল। সে উভয়েরই পরম মঙ্গল চাহিয়াছিল।

হইতে পারে বিমলাকে যখন মুক্তি দিল, তখনও বিমলার মনস্তত্ত্ব সে পূর্ণভাবে জানিত না। কিন্তু বোঝার ভুল থাকিলেও তাহার কাজের মধ্যে কোন অভিসন্ধি বা আন্তরিকতার অভাব ছিল না। দুয়ার খোলা রাখিয়াছিল বলিয়াই বিমলা যখন ফিরিয়াছিল—সেদিন কোনরূপ পরীক্ষা, কোনরূপ জিজ্ঞাসা—কিছুই সে করে নাই—আর বিমলাও তাহার পূর্ব স্থানটিতে নিঃসঙ্কোচেই প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। বিদ্বেষ ছিল না, ঘৃণা ছিল না, কোনরূপ অহংকারও ছিল না, ছিল কেবল প্রেমের মুক্তির উদার আলো।

নিখিল নিজের আদর্শে বিমলাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে নাই—এজন্য তাহার স্থিতি-প্রধান চরিত্রই যে দায়ী ছিল, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে বলিয়াছে "নিজের সঙ্গে নিজের চারদিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের নই, আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি।" অর্থাৎ যাহাকে বলে assertive—নিখিল তাহা একেবারেই নয়। নিজের কথাকে, নিজের আদর্শকে অপরের হৃদয়ে কর্মে চিন্তায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাহা দরকার, তাহার মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। তাহার কণ্ঠস্বরে সেই বজ্রনির্ঘোষ দৃপ্ত তেজ নাই, যে বিদ্যুৎগতি চলন প্রয়োজন, সেও তাহার নয়। কিন্তু যেদিন সে নিজেকে, বিমলাকে, উভয়ের সম্পর্ককে এবং ভালবাসাকে স্বরূপতঃ বুঝিতে পারিল, সেদিন বিমলা অলক্ষ্যেই মন্ত্র লাভ করিল এবং নিখিল সৃষ্টি করিবার যোগ্যতারও পরিচয় দিল।

শুধু ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে—

এক কথায় বিশ্বরূপের ক্ষেত্রেও যে নিখিলের জীবন বিস্তৃত ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এখানেও কোথায় তাহার ত্রুটি ছিল তাহা দেখিব। ঝড় উঠিবার পূর্বে নিখিল জানিত না যে বাহিরেরও, বস্তুরও একটা স্বতন্ত্র ও নিজস্ব মূল্য রহিয়াছে। সে স্থিতিরই অপেক্ষায় (in relation to) গতিকে, ভিতরেরই অপেক্ষায় বাহিরকে, ধর্মেরই অপেক্ষায় দেশকে, জ্ঞানেরই অপেক্ষায় কর্মকে স্বীকার করে। তাহার গতি, দেশ, কর্ম সবই স্থিতি, ধর্ম ও জ্ঞানের অনুগ। কিন্তু একথা সে জানিতে পারে নাই যে স্থিতি গতির অতীত হইয়াও উহার অনুগ; ধর্ম দেশের অতীত হইয়াও দেশের অনুগ; জ্ঞান কর্মের অতীতও বটে, আবার অনুগও বটে। কোন একটিকেই একমাত্র কৌলিন্য দান প্রাণঘন জীবনের ক্ষেত্রে চলিতে পারে না। এইখানেই রহিয়া যায় বস্তু সম্বন্ধে নিখিলের মিথ্যা ধারণা। সে দেশের অপেক্ষাও বড় করিয়া একটা ধর্মকে মানে; সে গঠনমূলক কাজকেই একান্ত শুভ বলিয়া বিশ্বাস করে, গড়িতে গেলে যে ভাঙ্গিতে হয়, একথা তাহার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে অনুপস্থিত। তাই বিলাতী পোশাক পোড়াইতে উৎসুক বিমলাকে সে বলে—"গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।" বিপ্লবের মধ্যে, ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলার মধ্যে যে সেই সঙ্গেই কোন কিছু গঠিত হইয়া উঠিতে পারে একথা একেবারেই বুঝিতে পারে না বলিয়া বিমলা যখন বলে যে "সেই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়" তখন নিখিলেশ যাহা বলে তাহাই তাহার

স্থিতি-প্রধান চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলে। ঘর আলো করিতে ঘরে আগুণ লাগানটা ভাল কথা নয়, কিন্তু সমস্ত দেশের চিত্ত আলো করিতে অনেক কাঠখড়িই পোড়াইতে হয়, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? নিখিল যখন বলে যে "দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি তারা দেশকেও মানছে না।"—তখন দেশকে সে তাহার নিজস্ব মূল্য হইতে বঞ্চিত করে। তখন সে ধর্মের এক সত্যকেই মানে, কিন্তু সেই ধর্মের সত্য যে অন্তহীনও, সে সত্যকে মানে না। সে জানে না "অন্তহীন এক অন্তহীন অনেকে আপনাকে প্রকাশ করে।" এবং ইহার প্রত্যেকটি প্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা উজ্জ্বল।

বস্তু সম্বন্ধে নিখিলের দৃষ্টি যে ঐক্যদেশিক ছিল, সে সম্বন্ধে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। "দেশ যেখানে বলে আমি আমাকেই লক্ষ্য করব, সেখানে সে ফল পেতে পারে কিন্তু আত্মাকে হারায়—যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে, সেখানে সকল ফলকেই সে খোয়াতে পারে কিন্তু আপনাকে সে পায়।" এখানে নিখিল বস্তুর—যেমন দেশের—কেবল 'পর' অবস্থাটিই লক্ষ্য করিল। কিন্তু বস্তুরও যে একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র মূল্য আছে, সে কথা জানিতে পারিল না। দেশ দেশের জন্য বটে, আবার দেশ দেশের জন্য নয়ও বটে, সে আত্মা বা ধর্মের জন্যও বটে। এই দুইটি "জন্য"ই স্বীকার না করিলে বস্তুকে, বাস্তবকে এবং বাস্তবাতীতকে, এক কথায় জীবনকে অস্বীকার করা হয়। এইজন্যই বলিতে হয় বস্তু সম্বন্ধে নিখিলের সত্য জ্ঞান ছিল না, তাহার জ্ঞান ছিল

ঐকদেশিক। একের একান্ত অপেক্ষায় (in relation to), একের একান্ত মানদণ্ডে এ বিশ্বে অপরের বিচার চলিবে না। ধর্মের অপেক্ষায় দেশের, নিখিলের অপেক্ষায় বিমলার বিচার যেমন করিব, আবার তেমনিই দেশের অপেক্ষায় ধর্মের, বিমলার অপেক্ষায় নিখিলের বিচার করিতে হইবে। তবেই শুধু প্রত্যেককে তাহার যথোপযুক্ত মূল্য দেওয়া সম্ভব হয়।

নিখিলের জীবনকে যে বিমলা কি রকম আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা আমরা নিখিলের জবানীতে পাইব—"আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেছি যে তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোট হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েছি বিমলকে জায়গা দিতে হবে বলে। তাতে করে হয়েছে এই যে তাকেই দিনরাত সাজিয়েছি, পরিয়েছি, শিখিয়েছি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেছি—মানুষ যে কতো বড়ো, জীবন যে কতো মহৎ সে কথা মনে রাখতে পারি নি।" সমস্ত ভালবাসার মধ্যেই খানিকটা পরিমাণে ব্যবধান না রাখিয়া চলিলে, খানিকটা বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্য না রাখিলে তাহাতে কাহারও কোন মঙ্গল তো হয়ই না, বরং পরস্পর পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখার মধ্য দিয়া ভালবাসা পঙ্কিল পচা ডোবার জলের মত বিকৃত হইয়া পড়ে। বিমলাকে দিয়া নিখিল নিজেকে যেরূপ আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার পরিণাম ভালবাসার বিকৃতি বা ক্লৈবের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও নিখিলের পক্ষে ঝড়ের প্রয়োজন ছিল। ঝড়ে নিখিলের জীবনের আকাশ বাতাস যখন ধূলি-সমাচ্ছন্ন, আর তাহারই মধ্য

দিয়া নিজের অন্তরস্থিত দীর্ঘনিশ্বাসের নিঃস্বনন যখন তাহার নিজেকেই ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাইয়া দিতেছে, তখন একদিন এই কথাটা তাহার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িল। পঞ্চু পুরাতন চুরির নারিকেল শোধ দিতে আসিয়াছে।—একদিন কি প্রয়োজনে নিখিলের বাগান হইতে সে নারিকেল চুরি করিয়াছিল ; যে-নিখিলকে সে ভক্তি করে তাহার নিকটে চুরির ভার হইতে মুক্ত হইতে সে সেদিন নিখিলের পায়ের কাছে নারিকেল রাখিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। পঞ্চুর হৃদয়ের সেই স্পর্শটুকু সেই সময়ে নিজস্ব ও স্বতন্ত্রমূল্যে উজ্জ্বল হইয়া নিখিলের কাছে ধরা দিল। আমিয়েলস্ জর্ণালে যে সময়ে কোন ফল হইতেছিল না, একটি জীবন্ত প্রাণের ক্ষুদ্র স্পর্শে তাহাই হইয়া গেল। সে বলিল—"একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।" বেদনাকে একমাত্র গভীর না করিয়া বিস্তৃত করিয়া দিলেই উহা সমতা লাভ করে। এক সময়ে বিমলাই তাহার জীবনের সবটা অধিকার করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু আজ অপরের সঙ্গের সম্পর্কটিও যে কত সত্য, তাহার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যটুকু নিখিলের চোখে ধরা পড়িল। নিজের বিস্তৃত জীবনকে দেখিতে পাইয়া নিখিল নূতন জীবন পাইল।

জীবনে যে পূরোপূরি সমগ্রটাই লইতে হয়, তবেই যে শুধু জীবনের প্রত্যেকটি উপাদানের সত্য সার্থকতা থাকে, যে-কোন একটি লইলে তাহা যে কিছুতেই অবিকৃত থাকে না—এ কথাটা একদিন

সন্দীপের কাছে নিখিল অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিল। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে সন্দীপ যখন বলিল—"...প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে, তারা চোখকে উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।" নিখিল তখন উত্তর দিল—"প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মানি, যখন তার সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোন জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেও নষ্ট করি, দেখতেও পাইনে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিসকে দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে সত্যকেও দেখতে পায় না।" প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তিও সম সত্য, প্রবৃত্তি রক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি হননও জীবনের পক্ষে অপরিহার্য সত্য। এই কথাটা জানিয়াও নিখিল কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র ইহা মনে রাখিতে পারে নাই। বিমলাকে ভালবাসার বেলায় সে নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে নিজেকে একান্ত জড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাই যেদিন নিবৃত্তিকেও দেখার প্রয়োজন নিজেই বোধ করিল, সেদিন তাহার বুকের নাড়ী টন্‌টন্ করিয়া উঠিয়াছিল। প্রতি বস্তুকে বাহির হইতে দর্শকের মত দেখিতে পারে নাই বলিয়াই সে প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করিয়াছিল, সত্যকেও দেখিতে পায় নাই।

বিমলার হৃদয়বৃন্ত হইতে চ্যুত হইয়া নিখিলের অবস্থা যখন স্রোতের ফুলটির মত আশ্রয়হীন টলায়মান, বিমলার প্রাণের স্পর্শ হইতে যখন সে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তেমন নিঃসহায় অবস্থায় তাহাকে রক্ষা করিয়াছে দুইটি মানুষ—একজন মাষ্টারমহাশয় চন্দ্রনাথবাবু, অপর মেজোরাণী। উভয়ের যথাস্থানে উভয়ের মূল্য অসীম। নিখিলের স্থিতিপ্রধান জীবন যদিও

প্রথমাবধিই চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়নে বসিয়াই পুষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার অনাবিল স্নেহের যে স্পর্শটুকু সময়ে অসময়ে নিখিলেশ পাইয়াছিল, তাহার জীবনের অতবড় দুর্যোগের দিনে উহা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে বিশেষভাবেই সাহায্য করিয়াছিল। মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ে বিশ্রাম চায়, হৃদয়ের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও সে বাঁচে না। এই হৃদয়ের স্পর্শের নমুনাভেদ আছে। হৃদয়ের এই স্পর্শগুলির প্রত্যেকটি অনন্য এবং জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কেবল একটি হৃদয়েই বাঁচিয়া মানুষ তৃপ্ত হয় না, বাঁচিতে পারেও না—সে কী তাহার সুখের দিনে, কী তাহার দুঃখের দিনে। নিখিল চন্দ্রনাথবাবুর স্নেহময় স্পর্শের মধ্যে যে আশ্রয় পাইয়াছিল, তেমন তাহার আর একটি আশ্রয় ছিল, সে বাড়ীর মেজোরাণীর হৃদয়ে। সেই প্রাণের স্পর্শটুকু না পাইলে নিখিলের পক্ষে সেদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। অত বড় আঘাতেও সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত জীবনের অন্তর বা বাহিরের কোন অংশেও যে অকেজো হইয়া পড়ে নাই, সে যে ইহারই মধ্যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তাহার প্রেমের উদার বিস্তৃতি প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেকটি স্পন্দনকে সুন্দর ও সার্থকভাবে চালাইয়া লইয়া আসিতে পারিয়াছে, সে শুধু এই কয়েকটি প্রাণের স্পর্শ সে পাইয়াছিল বলিয়া। মেজোরাণী ও নিখিল ভ্রাতৃবধূ ও দেবরই নহে, তাহারা উভয়ে বাল্যবন্ধু। মেজোরাণী যখন এ বাড়ীতে আসে তখন তাহার বয়স নেহাৎ অল্প, এবং নিখিলও তখন ছয় বৎসরের বালক মাত্র। সেই বাল্যজীবনের সকল খেলাধূলার মধ্য দিয়া উভয়ের মধ্যে যে

সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল তাহা ছিল অটুট। ইহারই মধ্যে মেজোরাণীর মনের মধ্যে নিখিলের জন্য একটি বিশেষ স্থান ছিল বটে, তবে নিখিল মেজোরাণীকে তাহার বাল্য সৌহার্দের প্রীতি ও ভ্রাতৃবধূর উপযুক্ত শ্রদ্ধা দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। মেজোরাণীর অন্তরের কথাটুকু যে সে জানিত না তাহা নহে, কিন্তু প্রবৃত্তির খোঁচাকে সে যেমন অনর্থক ধূমায়িত করে নাই আবার প্রাণের দাবিটুকুরও অপমান করে নাই। তাহার পরম দুঃখের দিনে মেজোরাণী তাহাকে যতটুকু আশ্রয় দিয়াছিল তাহা তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মেজোরাণী, চন্দ্রনাথবাবু ও একদিন পঞ্চুর প্রাণের একটুখানি স্পর্শ নিখিলের অন্তরে যে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছিল, তাহার জীবনের পোষণ ও রক্ষণের জন্য ইহাদের প্রত্যেকটির একটি বিশেষ স্থান ও মূল্য ছিল।

আমরা দেখিয়াছি নিখিল বিমলাকে প্রথমে পাইয়াছিল, কিন্তু সে পাওয়া ছিল পরস্পরকে না জানিয়া পাওয়া, তাহার পর হারাইয়াছিল, তাহার পর আবার পাওয়ার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়বারের পাওয়াটুকুর পিছনে রহিয়াছে উভয়কে উভয়ের জানা এবং জীবনকেও অধিকতর জানা। কিন্তু তবু একথা যেন মনে করা না হয় যে এই পাওয়াও পরিপূর্ণ বা শেষ। এই বিশ্বের প্রতি বস্তুটি এমন আশ্চর্যভাবে গঠিত যে ইহাকে পরিপূর্ণভাবে ফুরাইয়া ফেলিতে কোনদিনই পারা যাইবে না। জীবনটা অনন্ত চিন্ত্য ও অনন্ত অচিন্ত্য, অনন্ত প্রাপ্তি ও অনন্ত অপ্রাপ্তি, অনন্ত স্থিতি ও অনন্ত গতির

সমন্বয়ে গঠিত বলিয়াই অনন্ত পাওয়ার সাথে সাথে অনন্ত না-পাওয়া থাকিয়া যায়। প্রতি হাঁ-ধর্মী (Positive) বস্তুর সাথে সাথেই উহার না-ধর্মী (negative) অবস্থাটি মিলিয়া মিশিয়া আছে। তাই তো বিশ্ব এত আশ্চর্য, এত রহস্যময়, এত সুন্দর, নিত্য নূতন রূপ ধারণ করিবার তাই তো তাহার এত যোগ্যতা। সৃষ্টির অন্তরালের এই না-পাওয়া অচিন্ত্যকে কোনোদিনই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের মধ্যে আনা যাইবে না—যতই অগ্রসর হইয়া যাইব, সম্মুখে পথ ততই দীর্ঘ হইতে থাকিবে—ইহাই সৃষ্টি রহস্য—ইহাই বিশ্বের চিরন্তন ট্রাজেডি। ইহার জন্য কোন জবাবদিহি, কোন কারণ প্রদর্শন কিছুরই কোন মূল্য নাই। জগতের এই ধর্মের কাছে আমাদের মাথা নোয়াইতেই হইবে। কেবল বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া মূক হইয়া থাকা ব্যতীত আমাদের করণীয় আর কিছুই নাই। কিন্তু এই না পাওয়ার বেদনা পূর্বের বেদনা হইতে পৃথক। পূর্বের না-পাওয়া ছিল পরস্পরের বিচ্ছেদ হইতে সৃষ্ট, পরস্পরকে প্রকৃতভাবে না-জানার মধ্য দিয়া উদ্ভূত, প্রত্যেকে নিজেকে নিজের স্বরূপের ছাঁচে সৃষ্টি না করিতে পারার মধ্যে নিহিত। সে না-পাওয়া মোহ-জনিত, আর এই না-পাওয়া জগতের চিরন্তন ট্রাজেডি।

এইবার বিমলার জীবনকে এই ঝড় কিভাবে ভরিয়া তুলিয়াছিল, তাহা দেখিব। বিমলার চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমরা কিছুটা আলোচনা করিয়াছি। নিখিল ও সন্দীপের দুইচারিটি মন্তব্য তাহার চরিত্রকে কিরূপ উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। নিজের কথাতেও সে নিজের সুন্দর পরিচয় দিয়াছে। তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলিতেছিল তখন সে বর্তমানের আবেগের তীব্র গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল—টেরই পাইল না কত বড় একটা নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে। সেই সময়ে সে বলিতেছে—"এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব—তাদের হৃদয়াবেগ যখন একদিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে অন্যদিকে তাদের আর কিছুরই সার থাকে না। এইজন্যে আমরা প্রলয়ংকরী, আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো, কুলের মধ্য দিয়ে যখন বয়ে যাই, তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কুল ছাপিয়ে বইতে থাকি, তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।"

বিমলার সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন দেখি, সে যাহা পাইয়াছিল, তাহার জন্য তাহাকে কোন মূল্য দিতে হয় নাই। কোন প্রশ্নও সে নিজেকে করে নাই। যাহা পাইয়াছিল তাহাতেই তৃপ্ত ছিল, কোন জিজ্ঞাসাও কোনদিন তাহার আসে নাই। তাই নিখিল যখন সত্যের মধ্যে, বৃহতের ব্যাপ্তির মধ্যে নিজেদের পরিচয় পাকা করিয়া ভালবাসাকে সার্থক করিতে চাহিয়াছিল, তখন বিমলা নেহাৎ মূঢ়ের মতই জবাব দিয়াছিল। অপরদিকে সে ছিল প্রাণাবেগে একেবারে ভরপূর। নিখিল বিমলাকে বাহিরে আনিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গতিবেগের, প্রাণাবেগের যে তীব্রতা থাকিলে আত্মতৃপ্ত জিজ্ঞাসা-হীন বিমলাকে নিজের পরিচিত অন্তঃপুরটুকু ছাড়াইয়া বাহিরের অজানার মধ্যে আনা সম্ভব হয়, নিখিলের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। তাই দরকার হইল স্বদেশীযুগের একটা পরিবেশের টান। সেই স্বদেশীযুগের বাঁধভাঙ্গা মুক্তধারার গতিতে উৎফুল্ল বিমলা বলিতেছে—"সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবিরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে-জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম-সাধনা যে-সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগেছিল, সেদিনও তার বেড়া ভাঙেনি বটে কিন্তু সেই বেড়ার উপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।" স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, স্বদেশের উপকার করা—এ সকল ব্যাপার স্বদেশী-বন্যা দেশে আসিবার

আগেই নিখিলের জীবনে স্বাভাবিক ছিল, তবু সে-স্বদেশীতে বিমলা কোনদিনই সাড়া দেয় নাই কেন? যে-বিমলা স্বভাবতঃ রাণী, পরের জন্য ভাবিয়া ও খাটিয়া জীবনটাকে অতিবাহিত করিবার কোন ইচ্ছা যাহার কোনদিন ছিল না, সাজিমাটির ডেলা দেশী সাবান ও দাঁতনের কাঠি দেশী কলমের প্রতি নিখিলের প্রচণ্ড উৎসাহের খেয়ালে যে কোনদিন যোগদান করিতে পারে নাই, সামান্য ঘটিকে ফুলদানি করিয়া ব্যবহার করার মধ্যে নিখিলের যুক্তিকে যে কোনদিন বুঝিতে পারে নাই, সেই-বিমলাকে যে স্বদেশীর বন্যা আকর্ষণ করিতে পারিল তাহার কারণ সে-টান "বন্যার", যেমন তাহার ব্যাপ্তি, তেমনই তাহার তেজ। নিখিলের আহ্বানে সে ব্যাপ্তি, সে তেজ প্রকাশ পায় নাই।

সেই যুগের তুফানের দোলা বিমলার রক্তে যেই প্রথম লাগিল, সে বিলাতী পোশাক পুড়াইয়া ফেলিতে চাহিল; তাহার পরে মিস্ গিলবী নামক তাহার ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীকে ছাড়াইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু উত্তেজনার মোহে পড়িয়া বিলাতী পোড়ান এবং একমাত্র ইংরেজ হওয়ার অপরাধে মিস্ গিলবীর সঙ্গের এতদিনের প্রীতির সম্পর্ককে অস্বীকার করিয়া তাহাকে ছাড়াইবার প্রস্তাবে নিখিল সম্মত হইতে পারে নাই। এতদিন পর্যন্ত নিখিলের স্বদেশী দ্রব্য প্রচার চলে নাই, আজ উত্তেজনার মোহে পড়িয়া বিলাতী পোড়াইলেই কি স্বদেশীর প্রচলন হইবে? এ প্রশ্ন সত্য; তথাপি জীবন হইতে এ প্রশ্নকেও চাপা দেওয়া যায় না যে জীবনে উত্তেজনারও একটা

স্থান আছে। উত্তেজনাকে জীবনে একেবারে অস্বীকার করা যায় কি? উত্তেজনাকে জীবনে অস্বীকার করা যায় না,—যেমন বিমলার জীবনে যায় নাই। কিন্তু সেই উত্তেজনাকেই আমরা স্বীকার করিব, যে-উত্তেজনার পিছনে রহিয়াছে একটি বুদ্ধিপূর্ণ বিবেচনা এবং গঠনমূলক কর্মের সঙ্গে যে-উত্তেজনার সমযোগ স্থাপিত হইয়াছে। নিখিলের মধ্যে উত্তেজনা বা গতি ছিল অদৃশ্য। বিমলা উত্তেজনাকে অস্বীকার করিয়া, চাপা দিয়া রাখিতে পারে নাই, নিখিলের কথা সত্য বলিয়া অন্তরে বুঝিলেও নিখিলের গণ্ডী ডিঙাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যেখানে গিয়াছিল সেখানে সমন্বিত (harmonised) অবস্থা পায় নাই, তাই ফিরিতেও বাধ্য হইয়াছিল।

স্বদেশীযুগের প্রথম-হাওয়া যখন বিমলার দেহে মনে কাঁপন লাগাইয়া গিয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই বিমলার জীবন-রঙ্গমঞ্চে সন্দীপের প্রবেশ। সন্দীপকে সে পূর্বেও দেখিয়াছিল, তাহাকে তখন সে স্বামীর বন্ধু হিসাবেই দেখিয়াছিল কিন্তু এইবার সন্দীপের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। এই পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় ক্রমে নিখিল "পর" হইয়া যাইতে লাগিল, আর সন্দীপ "আপন" হইয়া উঠিল, তাহার জীবনে বৈঠকখানাঘরই অন্দর-মহলে পরিণত হইল। সে যতক্ষণ অন্দরমহলে থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিক সময় কাটায় বৈঠকখানা ঘরে—সেইখানেই তাহার সত্ত্বা অধিক স্ফূর্তি পায়। সন্দীপ বলিতেছে—"নিখিলের বৈঠকখানা ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদরে ও অন্দরে মিশিয়ে একটি উভচর জাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" বিমলার

পক্ষে "বাহির" আজ "ঘর" হইয়া গিয়াছে, ঘর তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তাই শুইবার ঘরে নিখিলের ফটোর সামনের ফুলগুলি আজ ধূলি-মলিন বিশুষ্ক। নিখিলের চিন্তা দূরে সরিয়া গিয়াছে, সন্দীপ তাহার সমস্তটা অধিকার করিতেছে। অথচ স্বামীর বন্ধু সন্দীপকে সে কোনদিনই ভালভাবে দেখিতে পারে নাই ; সে যে তাহার স্বামীকে ফাঁকি দিয়া টাকা বাহির করিয়া লয়, এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় ছিল। কিন্তু যে-সন্দীপ স্বদেশীর বার্তা লইয়া আসিয়াছিল তাহার বক্তৃতা শুনিয়া বিমলা বলিতেছে—"আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরও জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না। ...আমার মন বললে আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে।...সেদিন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ও অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।"—এই ঘটনার পর থেকে বিমলার মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের হাওয়া বহিল, তাহা তাহাকে ক্রমপরিণতির দিকে টানিয়া লইল ; তাহার যে একটা স্বতন্ত্রতা ছিল তাহা তাহার নিকট এই সময় হইতেই স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্দীপের বক্তৃতার মধ্যে যে-জিনিসটা বিমলা দেখিতে পাইল তাহা তাহার কাছে একান্ত নূতন, কিন্তু প্রাণের আবেগ ভরা বিমলার কাছে ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। উহার মধ্যে সে নিজের সাড়া পায়। সন্দীপের কথা বলার মধ্যে মোহ সৃষ্টি করিবার যে একটা ক্ষমতা তাহাই বিমলাকে শেষ পরিণতিতে লইতে সাহায্য করিয়াছিল।

সন্দীপকে খাওয়াইবার দিন হইতেই শুরু হইল। নিজের অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি খাইয়া ফিরিয়া আসা এবং সেই কথায় লজ্জা পাওয়া বিমলার অজ্ঞাতসারেই ঘটিতে লাগিল। ক্রমে বিমলা সন্দীপ-নিখিলের তর্কে যোগ দেয়। সেই সময় একদিন গতিবেগে চঞ্চল লজ্জাবিহীন সন্দীপ যখন বজ্রনির্ঘোষে বলিতে লাগিল—"যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুণের সুন্দরী দেবতা, তুমি আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।"—তখন বিমলা ঠিক বুঝিতে পারিল না কথাগুলি কাহাকে বলা হইল। কিন্তু সে যে ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি বোধ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি। ঠিক সেই সময় নিখিলের মাষ্টারমহাশয় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকিতে বিমলা তাঁহাকে প্রণাম করিল। চন্দ্রনাথবাবু যে আশীর্বাদ করিলেন তাহা শুনিয়া বিমলা মনে মনে বলিল—"ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।"

নিখিলের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে পুরুষের মধ্যে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ এমনকি অন্যায়কারীকে দেখিতে বিমলা ভালবাসে; শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয় করিতেই তাহার ভাল লাগে। "উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুণ করে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়—অন্য সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।" তাহার ঠিক এই পাওয়াগুলিরই আস্বাদ সে সন্দীপের মধ্যে পাইল। তাই ভাঙ্গন আরম্ভ হইতে

দেরি হইল না। একটা নেশার মধ্য দিয়া বিমলার দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার রক্তের ভিতরকার ধ্বনিটা সে প্রথমে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সন্দীপ তাহাকে বুঝাইয়াছিল তাহাকে যেন দেশের ভারি দরকার। বিমলা বলিতেছে—"ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে সেদিন সমস্তদেশে যা কিছু কাজ চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজবুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।" যাহা প্রকৃত ঘটিতেছিল তাহার সম্বন্ধে অচেতন থাকিতে সাহায্য করিয়াছিল এই গৌরববোধ। মেয়েদের হৃদয়াবেগের প্রবলতা সম্বন্ধে বিমলা যাহা বলিয়াছে সেই অন্ধ প্রকৃতিই তাহাকে অচেতন করিয়া রাখিতে প্রধানভাবে কাজ করিয়াছিল।

যাহাহউক ভিতরে ভিতরে বিমলা ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছিল সে কোথায় চলিয়াছে। তবু তাহাকে স্বীকার করে নাই, করিবার শক্তিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। সন্দীপ বলিতেছে এইসব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হইতেছে এবং অগোচরে থাকিতেছে, যে করিতেছে সেও সম্পূর্ণ জানে না। এই না-জানার কারণ সম্বন্ধে সন্দীপ বলিয়াছে যে, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়া দিয়া বস্তুকে স্পষ্টভাবে জানিবার পথ নিজের হাতে নিজে নষ্ট করিয়া থাকে। কেননা বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে; কিন্তু সে তাহার কাজ করিবেই। তাই মানুষের ঢাকাঢুকির মধ্য দিয়াই তাহাকে কাজ করিতে হয়। "মানুষ তাকে শয়তান বলে বদনাম দিয়ে তাকে তাড়াতে চেয়েছে, এই জন্যেই সাপের

মূর্তি ধরে স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে কানে কথা কয়েই মানব প্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে; তারপর থেকে আর আরাম নেই, তারপরে মরণ আর কি।"

এইভাবে নানা কথা, নানা কাজ ও অকাজের মধ্য দিয়া যখন বিমলা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে যে সন্দীপ দেশকে চাহে না, সে তাহাকেই নরনারীর নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে কামনা করিতেছে, তখনও সে বলিতেছে—"গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করি নি; আমি জানতুম দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছি··· কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে।······ আমি সত্য কথা বলব, এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি দিনরাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগল বড় মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কতো লজ্জা, কতো ভয়, কিন্তু বড় তীব্র মধুর সে।" এখন হইতে শুরু হইল সচেতন ভাঙন। ভাঙনের নেশাতেই ভাঙন, ইহার আর কোন উদ্দেশ্যই রহিল না। বিমলা বলিতেছে—"আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে। তাকে শ্রদ্ধাও করি নে, এমন কি তাকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। এও আমি প্রথমে না-হ'ক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে সন্দীপের মধ্যে যে-জিনিসটাকে পৌরুষ

বলে ভ্রম হয়, সেটা চাঞ্চল্যমাত্র।" কিন্তু তবু "আমার এই রক্তমাংসে, এই ভাবে ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল।" ইহার কিছু পরেই—"কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা মডারণকালের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে ভিতরে ইংরেজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি—সেই সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগান চলছে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাইনি—আমার মনে হতে লাগল এইটিই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।" সন্দীপ কি, সন্দীপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা কি রকমের—এই সমস্তই জানিয়া শুনিয়া বিমলা প্রলয়ের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সে জানে তাহার এই চলা যেখানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে সেখানে কোন 'স্থান' নাই অথবা কোন 'স্থানেই' ইহা তাহাকে লইয়া যাইবে না—কেবল অন্ধকারের অতল গভীরতা ছাড়া। ইহা কেবলই ভাঙনের আনন্দে ভাসিয়া চলা। সমস্ত অতীত অস্বীকৃত হইয়া যায়, সমস্ত ভবিষ্যৎ মুছিয়া ফেলিতে হয়, কেবল যখন চলিতেছে, তখনকারই যে-স্পন্দন রক্তের মধ্যে দোলা দেয়, বর্তমানের সেই দোলাতেই শুধু দোল খাইবার প্রবৃত্তি। কিন্তু তবু এই ভাঙনের মধ্য দিয়াই বিমলার প্রকৃতি উৎকৃষ্ট (sublime) হইয়া উঠিতেছে। এই যে অতীত ও ভবিষ্যতের দৃষ্টি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়—এ ব্যাপারটা সাধারণতঃ মেয়েদের পক্ষেই বেশি স্বাভাবিক—কেননা নারীর প্রাণ-প্রধান ব্যক্তিত্ব তাহার আর সকল বিবেচনাকেই

ডুবাইয়া দিয়া তাহাকে একটা অন্ধ প্রবৃত্তির আবেগে চালনা করে। প্রশ্ন উঠে মানুষের এই প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিব কি না। মানুষের কাছে এ প্রশ্ন চিরন্তন। ইহার সমাধান প্রচেষ্টায় কেহ ইহাকে একেবারে অস্বীকার করিতে চাহিয়া নানা নিয়মনিষেধ আইনকানুনের সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বাঁচাইতে চাহিয়াছে এবং সে নিয়মনিষেধের জের নারীকেই সহ্য করিতে হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশি; কেহ বা ইহাকেই একমাত্র স্বীকার করিয়া চলিতে চাহিয়াছে। প্রবৃত্তি সম্বন্ধে নিখিল বলিয়াছে— "প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেছি, নিজেকে কত দমন করেছি, সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন।" বিমলা সমস্ত ভুলিয়া প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া দেয়, নিখিল প্রবৃত্তিকে বঞ্চিত ও দমন করাকেই সাধনা বলিয়া গ্রহণ করে। উভয় মনোবৃত্তিই জীবনের পক্ষে গ্রাহ্য নহে। প্রবৃত্তি যতক্ষণ মাত্রার (measure) মধ্যে স্পন্দিত হইতে থাকে ততক্ষণ উহা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। জীবনের সমস্তটার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া প্রবৃত্তিকে যদি ভোগ করা যায়, তবেই জীবনের শক্তি ক্ষয় হয় না। বঞ্চিত কিংবা দমন করা অথবা উহাকে প্রচণ্ড ভাবে জ্বালাইয়া তুলিয়া বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা—এই দুইয়েরই মধ্যে যে-শক্তিক্ষয় লুকান থাকে তাহাই মানুষকে দুর্বল করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করে। ইহার প্রথম অবস্থাটির দৃষ্টান্ত নিখিল, তাই নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারিদিককে সে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে নাই। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত বিমলা—তাই সে অনর্থক চলাকে বরণ করিতে গিয়াছিল। জীবনের শক্তিকে ক্ষয় না

করিয়া কেমন করিয়া তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে ফুটাইয়া তোলা যায় তাহাই সাধনা হওয়া দরকার। ইহাদের কেহই প্রবৃত্তিকে অযথা দমন না করিয়া অথবা অযথা জ্বালাইয়া না তুলিয়া কেমন করিয়া উহাকে সামঞ্জস্যের ভোগের মধ্যে আনা যায় তাহার হিসাব রাখে নাই। মানুষ যতটা পর্যন্ত নিজেকে বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতে পারে, ততটা বিস্তৃতিকে স্বীকার করিয়াই প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। মানুষ একটা গোটা মানুষ—সে কালের কোন একটি অবস্থা লইয়া বাঁচে না, বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া সে বিস্তৃত। তদুপরি মানুষ কেবল নিজেকে লইয়া বাঁচে না। মানবসৃষ্টির আদি কালে কি ছিল এবং কি হইত তাহার আলোচনা আজকের দিনের আমাদের বিশেষ কাজ দিবে না। অতীতের দীর্ঘ ইতিহাস বহিয়া আসিয়া আমরা আজ একাধারে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীব। তাই আজকের দিনের মানুষকে যেমন কালের তিনটি রূপ মানিতে হইবে তেমনি এতগুলি অবস্থার সহিত সম্পর্ক স্বীকার করিয়াই চলিতে হইবে। মানুষ যতক্ষণ সহজ ও স্বাভাবিক, যতক্ষণ স্ব, শাস্ত্র বা বিদ্যা দ্বারা অর্জিত কোন সংস্কারদ্বারা নিজেকে আবদ্ধ না করিয়া ফেলে ততক্ষণ তাহার ভিতরের স্বরূপ ও বিশ্বরূপ গত (self life ও cosmic life) জীবনের প্রত্যেকটি বিশেষত্বের খোঁচা তাহার থাকিবেই। প্রতি মানবকে একটা গোটা ষোল আনা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে এই প্রতিটি বিশেষত্বের খোঁচা সার্থক করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। এইরূপ জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্তিকে ততটা স্বীকার

করা সম্ভব—যাহা করিলে কোন কিছুরই উপর চাপ পড়ে না এবং সেইজন্যই কোনটারই শক্তির অযথা ক্ষয় হয় না অথচ সব গুলিই বাস্তবে বিদ্যমান থাকে। জীবনের শক্তিকে ক্ষয় না করিয়া এই ভাবে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেই প্রবৃত্তি সার্থক হয়। নয়তো কেবল একই আবর্তের গভীর পাঁকে ঘুরাইয়া মারা ব্যতীত তাহার আর কিছু করিবার শক্তি থাকে না। প্রতিটি ক্ষেত্র আস্বাদন করিয়া, প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থিত হইয়া সমভাবে বিচরণ করিতে পারিলেই জীবনে সংঘর্ষ কমিয়া যায়, জীবন হয় একটা সহজ প্রবাহ। সেই প্রবাহে যে দুঃখের ঝড় থাকে না তাহা নহে—বরং জীবনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়—কিন্তু তাহার রূপ যায় বদলাইয়া। প্রতি বৃহৎ বস্তুতেই ঝড় থাকে, আলোড়ন থাকে, সমুদ্রেও তাহা আছে—কিন্তু গভীরতা ও ব্যাপ্তি সমভাবেই বিদ্যমান থাকিলে সার্থকতাও পাশেপাশেই থাকে। বিমলা প্রবৃত্তির এক আহ্বানে সাড়া দিতে যাইয়া যে আর সমস্তকে ডুবাইয়া দিতে বসিয়াছিল, তাহাকে যে নিখিলকে অস্বীকার করিতে হইয়াছিল, সংসারের প্রত্যেক সম্বন্ধকে অস্বীকার করিতে হইতেছিল—তাইতো তাহার এই চলাকে সে নিজেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতে পারে নাই। আমার যে-চলা দ্বারা সংসারে কাহারও সত্য অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় না, তেমন চলাই কাম্য। আমার জীবনের যে-বিস্তৃতিতে অপরের সত্য দাবি, অপরের প্রতি আমার বাস্তব কর্তব্য লঙ্ঘিত হয় না এবং যে-চলা আমাকে একটি বাস্তবিক পরিপূর্ণ ও বৃহত্তর জীবনের অধিকারী

করে, তেমন বিস্তৃতি, তেমন চলাই কাম্য। জীবনের একটি রূপকে স্বীকার করিতে যাইয়া যেমন অপরগুলিকে অস্বীকার করা যাইবে না তেমনি কোনও মহত্তর ও বৃহত্তর অবস্থাকে গ্রহণ না করিয়া সমস্ত জীবনকে অঙ্গীকার করাও যাইবে না। তাহা করা হয় নাই বলিয়াই বিমলার ঐ অন্ধ আবেগচালিত চলাকে, অগ্রগতিকে স্বীকার করা যায় না।

বিমলার এই যাত্রার ফলে সকলক্ষেত্রে যখন ভাঙাচোরার আন্দোলন শুরু হইয়াছে, নিখিলের কথা বাদ দিয়াও পরিবারের মধ্যে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে মেজোরাণী দরোয়ান ও দাসীদের দ্বারা বিমলাকে তাহার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিবার ব্যবস্থা করেন। তখন তাহারই প্রতিক্রিয়ায় নিজের ভিতরের এবং বাহিরের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বিমলা একদিন বলিতেছে—"...চারদিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে।"—এই চারিদিকের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলাটাই জীবনে প্রয়োজন—সেইটি শিখিতে বিমলার দীর্ঘদিন লাগিয়াছিল।

সন্দীপের স্তব, তাহার পূজা, তাহার দৃপ্ত বচন—ইহাই বিমলাকে জিয়াইয়া রাখে। সন্দীপের স্তব শুনিতে শুনিতে বিমলা ভুলিয়া যায়, যে সে বিমলা। সে শুধু শক্তিতত্ত্ব, শুধু রসতত্ত্ব, তাহার কোন বন্ধন নাই। কিন্তু যখন অন্যদিক হইতে নিন্দা সমালোচনা শুনিতে হয়, তখন প্রথমে হয় রাগ, তারপরেই গ্লানিতে সমস্ত মনটা ভরিয়া যায়। যখন স্তব শোনানতে ভাটা পড়ে, প্রাণ ছটফট করে, নিজের মূল্য নিজের কাছেই কমিয়া যায়—স্তব শুনিবার জন্য ছুটিতে হয়, থামিলেই গ্লানি আসে, নিজেকে

আর বুঝি রক্ষা করা যায় না। বিমলা বলিতেছে—"আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে। কেবল আছে আবেগ আর চলা।" যাহার জীবনে ঘরও গিয়াছে, পথও গিয়াছে, তাহার কী নিদারুণ অবস্থা। কিন্তু মানুষ এমন ভাবেই আত্মবিস্মৃত হয় যে এই দুই হারাইয়াও সে সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে না। আজ চলাতেই বিমলার একমাত্র দৃষ্টি। তাহার যে ফিরিবার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে এখন মনে করিতেছে ঘন অন্ধকারই বুঝি একমাত্র সত্য; আলোর পিপাসা বুঝি কোনদিনই আর জাগিবে না, সে খোঁচাকে বুঝি একেবারে দম বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা সম্ভব হইয়াছে। তাই যদিও প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে রাত যখন রাঙা হইয়া পোহাইবে তখন ফিরিবার পথের চিহ্ন কি দেখিতে পাওয়া যাইবে? তবু সে বলিতে পারিতেছে—"কিন্তু ফিরব কেন মরব। যে-কালো অন্ধকার বাঁশি বাজাল, সে যদি আমার সর্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে, তবে আর আমার ভাবনা কিসের? সব যাবে, আমার কণাও থাকবে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে—তারপরে কোথায় ভালো, কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি, কোথায় কান্না।" কিন্তু এমন করিয়া যে জীবনের অপর সকল দিকগুলিকে চাপা দিয়া রাখা যায় না—বিমলার জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিমলা যেদিন হাট হইতে বিলাতী বর্জনের সদুদ্দেশ্য লইয়া স্বামীর কাছে গিয়াছিল, বিমলার জীবনে সে দিনটি একটি বিশেষ

দিন। নিজেকে সে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল; তাই যে-সম্বন্ধের মূলে আঘাত লাগিয়াছে, যাহার জীবনীশক্তিই শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, তাহাকে সেই অবস্থায়ই রাখিয়া কেবল বাহিরের সাজগোজের দ্বারা উপর হইতে তাহাতে জল সিঞ্চন করিতে গিয়াছিল। নিখিলের প্রতিঘাত তাহাকে সচেতন করিল। সে-লজ্জা সে ঢাকিবে কী করিয়া? এত বড় ব্যর্থতা বিমলার জীবনে এই প্রথম। এই ব্যর্থতাকে ব্যর্থতা বলিয়া বুঝিয়া লজ্জা পাইয়াছিল বলিয়াই ইহা তাহার জীবনকে সার্থকতার মধ্যে আনিতে পারিয়াছিল। বিমলা বলিল—"এই ন-বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখি নি।" প্রেমের আদরে লালিত বিমলার কাছে নিখিলের এ বৈপরীত্য অভাবনীয়। এ বৈপরীত্য বিমলাকে প্রচণ্ড আঘাতে জাগাইয়া দিল। সে চাহিয়া দেখিল এই কয়মাসে তাহার জীবনটা কী একটা অদ্ভুত বেগে কিসের দিকে ধাবিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে—সে যেন স্বপ্নের ঘোরে এতদূর পথ ছুটিয়া আসিয়াছে। এত বড় একটা পরিবর্তন অতি দ্রুত সম্পন্ন হইয়াছে—"সময় এত জোরে চলছিল যে চলছে বলে বুঝতেই পারি নি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেছি।" হাট হইতে বিলাতী সরাইবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার অব্যবহিত পরেই একদিন বাগানে চাঁদের আলোতে দাঁড়াইয়া নিখিল বিমলাকে ছুটি দিল। বিমলা যখন সন্দীপের আকর্ষণের মদের নেশায় অন্ধকারের গভীর তলায় পাগলের মত ছুটিয়া চলিতেছিল, তখনও সে একদিনও নিখিলের বন্ধন হইতে মুক্তি চায় নাই। তাই সেই অযাচিত ছুটি যেদিন পাইল সে নিজের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল,

অনায়াসেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। "ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিংবা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিস ?...... মাছের মতো আমি চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি—হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে, এই তোমার ছুটি—তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারি নে, বাঁচতেও পারি নে।" নিখিলের নিকট হইতে ছুটি পাইয়া বিমলার শুইবার ঘরে শুধু আসবাব ; সেই আদর আজ অনুপস্থিত, সেই হৃদয়, যাহা বস্তুর বস্তুত্বকে ঢাকিয়া রাখে, তাহা আজ নাই ; আজ তাই শুধু খাট, শুধু আলনা।

আবেগপ্রধান, বিশ্লেষণ ও বিবেচনায় স্বল্পবুদ্ধি নারীর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী নয়। কোন জিনিসের অনেকদূর পর্যন্ত সে দেখিতে পায় না। জানাকে বাদ দিয়া শুধু মানিতে যাইয়া দৃষ্টি স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ হইয়া আসে। রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগের" কুমুদিনী তাহার দাদাকে বলিতেছে—"তোমরা অনেক জানো তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে।" অনেক দূর পর্যন্ত দেখিতে না পারার ফলে বিমলার জীবনে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা দেখিয়াছি। এখানে না দেখিতে পারার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব।

সন্দীপের প্রতি মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বিমলা যখন চলিতেছিল তখন তাহার সম্পর্কে নিখিলের মনোভাব কী হইতে পারে, তাহার প্রতি নিখিলের প্রেম কোনদিন ব্যাহত হইতে পারে কি না, যে-প্রেম তাহার জীবনে প্রাকৃতিক জলবায়ুর মতই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল—সেই প্রেমের পরিবর্তন হইলে তাহার অবস্থা

কী হইতে পারে—এমন কথা কোনদিন তাহার কল্পনায়ও স্থান পায় নাই। সে হয়তো বা মনে করিয়াছিল যাহা লাভ করিবার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় নাই, তাহা রক্ষা করিবার জন্যও বুঝি কোন মূল্য দিতে হইবে না।

সন্দীপ বিমলাকে স্তব করে। বিমলা মোহিত হয়। কিন্তু তাহাকে স্তব করার অবস্থা ছাড়াও যে সন্দীপের একটা অবস্থা আছে, সেই সন্দীপের রূপ কিরকম এবং তাহাকে স্তব করা যেদিন সন্দীপের বন্ধ হইবে সেদিন তাহার সম্বন্ধেই বা সন্দীপের মনোভাব কী হইবে—এ সকল কথা হতভাগ্য বিমলা ভাবিয়া দেখে নাই। কালকে সে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিল।

নিখিল যেমন বিমলার স্বরূপের পরিচয় না লইয়া নিজের মত করিয়াই তাহাকে চাহিয়াছিল, অপরদিকে বিমলাও নিখিলের জীবন জিজ্ঞাসার, তাহার আদর্শের, তাহার অন্তর বাহিরের প্রকৃতির স্বরূপের পরিচয় লয় নাই। সে কী চায়, কী বলে, কী তাহার মূল্য, সে সব কথা ভাবিয়া দেখে নাই। এইজন্য সে যেমন নিখিলের আদর্শগত কোন কথা বুঝিতে পারিত না তেমনি নিজের জীবনে এক ফাঁকেরও সৃষ্টি করিয়াছিল।

যাহাহউক, বিমলার হৃদয়ের যখন এই অবস্থা তখন আবার দেখা সন্দীপের সঙ্গে। আবার সেই স্তবে, সেই পূজার বাণীতে "প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন তো আবার তেমনি করেই জ্বলল।" তাহার পর আসিল টাকা জোগাড়ের পালা। সন্দীপের কাছে হাওয়ার উত্তাপ যখন প্রচণ্ড, তখন যে-ব্যাপার অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সন্দীপ যখন অনুপস্থিত

তখন উত্তাপের অভাবে তাহা তুর্লজ্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মূরলী-বাঁশটির মত কাঁচা অমূল্যের উপর টাকা জোগাড়ের ভার দিতে আসিয়া বিমলা নিজের মধ্যে যে মাতৃত্বের পরিচয় পাইল, তাহা অনাস্বাদিতপূর্ব। সে যে কেবল মোহিনী শক্তিতত্ত্ব বা রসতত্ত্ব নয়, সে যে নিখিলের আদরের স্ত্রীও বটে, সে যে বাড়ীর গৃহিণীও বটে—এ সকল কথা তাহার কয়দিন হইতেই মনে হইতেছিল কিন্তু এখন আর এক আস্বাদন আসিয়া জুটিল—সে যে মা—মাতৃত্বের এই আহ্বান সে অস্বীকার করিবে কি করিয়া? অমূল্যের বয়সের অনুপাতে তাহার ব্রতের কথা মনে করিয়া তাহার মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল—সে বলিল—"আমার দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরছে না? কেন একে বলছে না, ওরে বাছা আমাকে তুই বাঁচিয়ে কী করবি, তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম।...আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্ছে—এই ছেলেটিকে তুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।"

সন্দীপ যেখানে হৃদয়ের মধ্যে আটকা পড়িয়া অগ্রসর হইতে সংকোচ বোধ করে, কেমন তুর্বল হইয়া পড়ে—সেখানে সেই তুর্বলতা বিমলাকে মুগ্ধ করে না; সন্দীপের আবেশের ধোঁয়ায় বিমলার মন একদিক দিয়া যদিও আবিষ্ট হয় কিন্তু তাহার মনে ঘৃণাও আসে। সন্দীপের অসংকোচ পৌরুষের আগুনেই বিমলা নিজের পাখা পুড়াইয়াছিল, তাহার নিকট হইতে সংকোচের তুর্বলতা সে সহ্য করিতে পারিবে কেন?

মাতৃত্বের আস্বাদন ও সন্দীপের তুর্বলতায় ঘৃণা—এ সকল

ছাপাইয়া সন্দীপের সংসর্গে প্রেয়সী নারী আসিয়া মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে আবার তালা লাগাইয়া দিল। আবার সকল দিক ভুলিয়া বিমলা চলিল। তথাপি ইহারই মধ্যে মধ্যে বলিতেছে —"অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেছে—আজ আমি যা কিছু করছি সে আমার নয়—সে তারই লীলা।" ইহার পরেও সেই অপদেবতারই দৌরাত্ম্যে সে স্বামীর সিন্দুক হইতে টাকা চুরিও করিয়াছে; কিন্তু সেই সাথে সাথে ইহাও না বলিয়া পারে নাই—"মাগো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে, কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারেই ফতুর করে নিলে।"

এই চুরিতে অপরাধ কোথায় কি ভাবে বিমলাকে স্পর্শ করিয়াছে, বিমলা তাহা নিজেই বুঝিতেছে—"ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি দেশকেই লুটেছি—এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হতো পূজা, দেবতা তা গ্রহণ করতেন; কিন্তু চুরি তো পূজা নয়।" চুরি পূজা নয়। এ চুরি কাহার নিকট হইতে করা হইতেছে?—এ যে তাহার স্বামীর। স্বামীর টাকা বলিয়াই যে অপরাধ তাহাও নয়; তেমন স্বামী যে কেবল তাহারই ভালবাসার পাত্র নয়, যে নিজেও একজন দেশসেবকও বটে; তেমন স্বামীর বিশ্বাসকে চুরি করা হইল বলিয়াই অপরাধ। তাহার স্বামী তো দেশদ্রোহী নয়, দেশের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা তাহাকে

নানাকাজেই প্রবর্তিত করিয়াছে। দেশের কথাও যদি বাদ দেই, বিমলা নিজে পাঁচ হাজার টাকা চাহিলেও যে নিখিল দিত না, তাহাও তো নয়—তবু যে এই চুরি করা হইল ইহাই অপরাধ। বিমলা তাহা নিজেই বুঝিতেছে—"আজ আমি এই যে চুরি করে আনলুম, এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি—বিশ্বাস চুরি, ধর্ম চুরি।"

বিমলার এই লজ্জা, প্রাণের এই বেদনা সন্দীপের মত পুরুষের প্রাণে কোন রেখাপাতই যে করিবে না, বিমলা তাহা জানিত, তাই বলিতেছে—"প্রাণের পরে দরদ নেই ওদের, ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে। হায় রে, এদের কাছে আমি কেই বা। বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মতো।" কিন্তু পথের শেষটা, পথকে বাদ দিয়া উদ্দেশ্যটাই তো একমাত্র কথা নয়। পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় সেই চলার প্রতি ক্ষণটিকে সার্থক করিতে হইবে যে। পথ এবং পথের শেষ—দুইটাই সম সত্য কি না। হৃদয়ের এই বেদনাকে মাড়াইয়া গেলে চলিবে কেন? সন্দীপ এই যে মাড়াইয়া যাইতে পারে, এইখানেই বিমলা সন্দীপের মনস্তত্ত্বের পরিচয় পায়। তাহার প্রাণের কাছে ইহা একটি আঘাত। এই ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলিই আবার বিমলাকে প্রকৃতিস্থ হইতে সাহায্য করে। বিমলা ভাবিয়াছিল সন্দীপের কাছে দীক্ষিত বালক অমূল্যকেও ইহা স্পর্শ করিবে না। কিন্তু দেখিল বালকের প্রাণ তাহার এই চুরির অবমাননা বুঝিতে পারিয়া ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বিমলা প্রাণ পাইল,

অভিভূত হইল, সেই স্পর্শটুকুর মধ্যে সেই সময় সে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল।

কিন্তু মোহ সৃষ্টি করিবার অমোঘ অস্ত্র সন্দীপের হাতে। তাই সন্দীপের স্তবে আবার বিমলাকে বলিতে হয় "মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেই-জন্য ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে, সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে, কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।" কিন্তু বিমলার এবারকার মোহাভিভূতের অবস্থারও সুর বদলাইয়াছে। এখন সে নিজেকে দুইভাগে ভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে এখনও বিমলার কাছে বর্তমানটাই একমাত্র সত্য, তাই যতক্ষণ সে তাহার শক্তির উৎসের নিকট উপস্থিত থাকে, সেই সময়টুকুই সত্য; তারপরেই গ্লানিতে, শ্রান্তিতে, অবসাদে দুই দিক ছাইয়া যায়, নিজের অস্তিত্ব নিজের কাছেই ভয়াবহ হইয়া উঠে; নিজের মনের মধ্যে নিজের উপরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচাইয়া রাখিবার সম্বল যে তখন কিছুই থাকে না—এ কথা বিমলা ভাল করিয়াই বুঝিতেছিল; তাই "আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারি নে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে নিষেধের হাত বাড়ায়; আপনার ভিতরের আপনার এই অপমান থেকে পালাতে ইচ্ছা করে—কেবলই মনে হয় সন্দীপের কাছের থেকে স্তব শুনি গে।" সন্দীপ যেরূপ প্রকৃতির মানুষ তাহাতে বিমলাকে একেবারে তুলিয়া লইবার শক্তি তাহার নাই।

তাহার মধ্যে গতিই সর্বাপেক্ষা বড় সত্য, বর্তমানই একমাত্র সত্য, বস্তুকে বাহিরের দিক হইতে যতটা ও যেরূপ দেখা যায়, তাহার সম্বন্ধে তাহাই একমাত্র ও চরম কথা। তাই সে যতটা ভাঙ্গিয়াছে, ততদূর পর্যন্তই তাহার ক্ষমতা; কোন কিছু গড়িয়া তুলিয়া স্থিত হইবার প্রকৃতি তাহার নয়। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে সন্দীপের যে পরিচয় পাই, তাহা বিশ্লেষণ করিলে এই মনে হয় যে বিমলার অন্তরকে ও তাহার বাহিরের আবেষ্টনকে জয় করিয়া বিমলাকে লইয়া যাইবার শক্তি তাহার নাই।

টাকার অপেক্ষাও দেওয়ার মত বড় কিছু বিমলার কাছে ছিল, একথা বিমলা সন্দীপের মুখেই শুনিয়া আসিতেছিল। কিন্তু টাকা দিতে যাইয়া সে যে একেবারে ফতুর হইয়া গিয়াছে। যে মুহূর্তে সে তাহার স্বামীর টাকা চুরি করিয়া সন্দীপের হাতে দিয়াছে, সেই মুহূর্তে সন্দীপের মোহবাণের সমস্ত উজ্জ্বলতা তাহার নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলিয়া গিয়াছে। বিমলা তখন নিজের কাছেই নিজে সস্তা হইয়া গিয়াছে। "মুঠোর ভিতর যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না।"—এখন হইতে বিমলা নিজের মধ্যে নিজে ফিরিয়া আসিল। নিখিলের নিকট হইতে উদাস দৃষ্টি, তাহার ছুটি দেওয়া, অমূল্যের প্রতি মাতৃস্নেহের সঞ্চার, টাকার ব্যাপারের মধ্য দিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা এবং সর্বোপরি বিমলার জন্য নিখিলের হৃদয়ের দুয়ার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া খুলিয়া রাখা—পরপর এতগুলি ঘটনা বিমলাকে তাহার চেতনার মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিয়াছিল। টাকার ব্যাপারটার

গুরুত্ব বোধ হয় সকলের অপেক্ষা বেশি। কেননা পরভৃৎ হওয়ায় কোকিলের সুরমাধুর্য নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে টাকা পয়সার ব্যাপারে নিছক প্রীতির সম্পর্ক মলিন হইয়াই যায় —বিশেষতঃ যেখানে সেই টাকার প্রতি টাকা হিসাবেই একটা লোভ থাকে, আর এমন করিয়াই তাহা চুরি করিয়া আনিতে হয়।

"যে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে—সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে" —মাতৃস্নেহের সিক্ততায় যদিও বিমলা মনে করিয়াছিল অমূল্যকে বাঁচাইবে, কিন্তু তাহা যে তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে কথা নিজে বুঝিতে পারিতেছিল। অমূল্যের চিন্তা বিমলার মনকে ক্রমেই পবিত্র করিয়া তুলিতেছিল। যখন সে ভাবিয়া কোন দিকেই আর কুলকিনারা পায় না, তখন এক একবার মনে করে আর সে কিছুই ভাবিবে না—যাহা ঘটিবার ঘটুক। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মোৎসর্গের দীপ্তিতে সুন্দর বালকের মুখখানা মনে পড়ে। সে তো চুপ করিয়া ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নাই, সে তো মরণের মুখে ছুটিয়াই গিয়াছে। সে যে বিমলার বালক-দেবতা। এই বালকদেবতার ধ্যানে বিমলা ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া আসিল। মানুষকে যখন পতনের গহ্বর হইতে উপরে উঠিতে হয়, তখন এমনই কোন একটি ক্ষুদ্র অথচ পবিত্র প্রাণের টানের মধ্যে না পড়িলে একমাত্র নিজের বিচার বিবেচনায় সে উঠিতে পারে না। যে কোন প্রাণের টানের শক্তি বিচার বিবেচনার শক্তি হইতে অনেক বেশি; তাই স্থিত হইতে হইলে আর একটি প্রাণের টানের সাহায্যেই স্থিত হইতে হইবে। অমূল্যের প্রতি স্নেহের

মধ্যে যে-প্রাণের স্পর্শ সে পাইয়াছিল, তাহার স্নিগ্ধতায় সকল অমঙ্গল দূর হইয়া তাহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিল, তাই নিখিলের প্রেমের মধ্যেও সে ফিরিয়া আসিতে পারিল। সংসারে নিখিলের সঙ্গেই তাহার একমাত্র সম্পর্ক নহে—নিখিলের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক যেমন স্বতন্ত্র এবং তাহার যেমন একটি স্বয়ংমূল্য আছে, তেমনি সংসারের প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের বিশেষ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংমূল্যের সম্পর্ক। নিখিলের সঙ্গে যেমন, অমূল্যের সঙ্গে তেমনই, মেজোরাণীর সঙ্গেও তেমনি এবং গৃহিণী হিসাবে সংসারে প্রত্যেকের সঙ্গেই তেমনি। সম্পর্ক যখন প্রাণের, তখন সেই প্রাণের সম্পর্কে প্রত্যেকের যথাস্থানে তাহার একটি স্বতন্ত্র ও নিজস্ব মূল্য থাকে। ইহার যে-কোন একটিকে ধরিয়াই মানুষ তাহার ভুলের পথ উৎরাইয়া আসিয়া যথাস্থানে স্থিত হইতে পারে। বিমলা যখন ফিরিতেছিল তখন অমূল্যের প্রতি স্নেহের দিকটিই বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে বলিয়া একথা মনে করা ভূল হইবে যে বিমলা নিখিলের প্রেমের মধ্যে ফিরিতে পারে নাই। প্রাণের স্পর্শের যে-কোন একটি ঘটনাই সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে পারে। বিমলার ক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছিল। অন্যান্য ঘটনাও সেখানে ছিল, কিন্তু অমূল্যের সঙ্গে তাহার প্রাণের সম্বন্ধের টানটিই তাহার জীবনে পরিবর্তন আনিতে মুখ্য ও বিশেষ। এখন বিমলা এমন একটি অবস্থায় আসিয়াছে, যখন সে নিজেকে নিজের মোহ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারিতেছে। তাহার অন্ধ চলা যে কতদিকে কিভাবে আগুন ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহার সংস্পর্শে

যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের সকলকেই অমঙ্গলের প্লেগ যে অল্পবিস্তর স্পর্শ করিয়াছে তাহা বিমলা বুঝিতে পারিতেছে।

গয়নার বাক্স লইয়া অমূল্যকে বিপদে ফেলা, সন্দীপের তাঁহার প্রতি আকর্ষণ, টাকা চুরি, অমূল্যের জন্য উদ্বেগ—এইগুলি দ্রুতবেগে বিমলাকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। যে-মেজোরাণীকে সে চিরদিন একরকম অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়াছে, তাহার কাছে নিজের অপমান আজ তাহাকে বিঁধিতেছে। আজ আবার সমস্ত দিকেই সকলের মধ্যে নিজের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। তাহার স্বামীর সঙ্গে যে সন্দীপের কোন তুলনা হয় না, তুলনা করিতে গেলে যে নিখিলই অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দেয়, সন্দীপের মধ্যে যেটাকে পৌরুষ বলিয়া ভ্রম হয় সেটা যে চাঞ্চল্যমাত্র, ইহা সে আগেই বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সন্দীপের প্রতি মোহের ভূতটাকে কিছুতে ঘাড় হইতে নামাইয়া নিজের প্রকৃত অবস্থাটি দেখিয়া লইতে পারিতেছিল না। তাই এই যে-মোহটাকে সে কিছুতে নিজের থেকে বাহিরে রাখিতে পারিতেছিল না, সেটাকে ছাড়ানই দরকার। এজন্যই অমূল্যের ক্ষুদ্র প্রাণের স্পর্শের টান দরকার হইয়াছিল। মানুষের যে-কোন কর্ম বা চিন্তা যখন এইরূপ মোহাভিভূতের অবস্থায় কৃত হয়, জীবনের পক্ষে তখনই সেটা বোঝা হইয়া, উপদ্রব হইয়া দাঁড়ায়। নিজেকে অনেকটা মুক্ত করিতে পারিয়া বিমলা জীবনটাকে আবার প্রথম হইতে শুরু করিতে চাহিতেছে। সে বলিতেছে "ভগবান এমন কিছু করো যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। একেবারে নূতন হতে পারি নে কি? সব

ধুয়ে মুছে—আর একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো, প্রভু।”

কিন্তু যতক্ষণ সন্দীপের প্রতি মোহ বা বিতৃষ্ণা কোনটাই থাকিবে, ততক্ষণ সন্দীপকেও যেমন দূরে সরান যাইবে না, নিজেকেও মুক্ত করা যাইবে না। সন্দীপের প্রতি বিতৃষ্ণা, ও ঘৃণা বিমলার তখনও ছিল, তাই সন্দীপ আবার যখন স্তব করিল, বিমলা আবার অভিভূত হইল। লেখক শেষ পর্যন্ত বিমলা ও সন্দীপের সম্পর্ককে যে অবস্থায় লইয়া শেষ করিয়াছেন, সেখানে বিমলা সেই মোহের ভূত হইতে ছাড়া পাইয়াছে, নিজেকে স্বচ্ছ করিয়া দেখিতে পারিতেছে, অথচ সন্দীপের প্রতি তাহার পূর্বের মোহের আকর্ষণ কিংবা ঘৃণা বা বিদ্বেষ কিছুই নাই ; আছে শুধু উদার প্রীতির আলোর বিস্তৃতি —সেই বিস্তৃতির মধ্যে নিখিলের স্থান নিখিল পাইল এবং সন্দীপেরও তাহাতে স্থান হইল। সন্দীপের জীবনে “কিন্তু” প্রবেশ করিয়াছে, অন্ততঃ বিমলার নিকট হইতে সে কিছুই লইতে পারিবে না ; গিনি ও গয়নার বাক্স রাখিয়া তাহার প্রলয়-রূপিণী হৃৎপিণ্ডমালিনীকে বন্দনা করিয়া সে যখন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—বিমলা তখন শুধু স্তব্ধ হইয়া রহিল। গিনি ও গয়নার বাক্স যে কত তুচ্ছ—জীবনে সকল দিক দিয়া কেবল চলিয়া যাওয়াটাই যে সত্য প্রয়োজন—এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। “সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা” সেই কথাটা সে আজ বুঝিতে পারিল। সন্দীপের প্রতি তখন তাহার মোহ কিংবা বিদ্বেষ কিছুই ছিল বলিয়া লেখক

দেখান নাই। এইখানেই বিমলা বন্ধনের মধ্যেও মুক্তি পাইল, মুক্তির মধ্যেও বন্ধন রাখিতে পারিল।

বিমলা ও সন্দীপের মধ্যে যে সম্বন্ধটি, তাহাকে মোহের আবেশ হইতে পৃথক করিয়া ধরিলে বুঝা যায় যে সত্য ও বাস্তব হইতে হইলে তাহাকে বিস্তৃত ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যেই রাখিতে হইবে। নহিলে কিছুতেই তাহাকে সহজ স্বাভাবিকভাবে জীবনে স্বীকার করা যাইবে না। সেই কথাটা সন্দীপ আগেই বুঝিতে পারিয়া বলিতেছে—"পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে পড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে—মুহূর্তের অন্তরে যা অনন্ত, তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম—আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না,—এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে ভাঙবে করছিল—আজ তোমার বড়ো মূর্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজো করতে চল্লুম—তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব—এখানে তোমার কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছে বর পাব।"—এইখানে সন্দীপ নিজের, বিমলার ও সংসারের প্রকৃত মনস্তত্ত্ব ধরিতে পারিয়াছে। এইখানেই সে সার্থক হইল।

অমূল্যকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া প্রতি ক্ষণটি বিমলা গণিতেছে। সে মরিতে চায় না, সে বুঝিতেছে যে-প্রলয় সে সৃষ্টি করিয়াছে, মরিলেই তাহার শেষ হইবে, সে রেহাই পাইবে—এমন কথা কোনমতেই সম্ভব নয়—"আমার মনে হচ্ছে যেন

মরার মধ্যে আরও ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার, তা বাঁচার মধ্য দিয়েই চুকোতে পারি, অন্য উপায় নেই।" জীবনে যে দ্বন্দ্বসমাকুল সংগ্রামের অবতারণা করা গিয়াছে, তাহার সমাধান জীবনের মধ্যেই করিতে হইবে। মরিয়া যদি সমস্যার সমাধান হইত, তবেই মরিবার প্রশ্ন আসে। মরণের সাক্ষ্যে জীবনের বিচার করা ক্লীবত্বের পরিচায়ক। জীবনের প্রশ্ন মৃত্যু দিয়া সমাধান করিতে গেলে 'জীবনকে' ফাঁকিই দেওয়া হইবে শুধু। যে সব সমস্যা বিমলার জীবনে উঠিয়াছে, মরিলে সেগুলিকে খুববেশি হয় তো শুধু চাপা দেওয়া যায়, সমাধান তো হয় না ;—তাই কোন সান্ত্বনাই তাহাতে নাই। জীবনের ঘটনার মীমাংসা জীবনের ঘটনা দিয়াই করিতে হইবে ; সকল বিপর্যয়ের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়াই বিপর্যয়কে জয় করিতে হইবে, জীবনে জয়ী হইতে হইবে। বিমলার কী মর্মান্তিক অবস্থা ; বুকের মধ্যে শান্ত হইবার, স্থিত হইবার, সমস্ত ঘটনাকে স্বীকার করিয়াই চলিবার একটা তীব্র বেদনা, একটা গভীর প্রার্থনা জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কিছুই দানা বাঁধিয়া ঘন হইয়া উঠিতেছে না ; পথ আর দেখা যাইতেছে না। সেই সীমাহীন বেদনার মধ্যে বিমলা প্রার্থনা জানাইতেছে—"এবারকার মতো একবার আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু। যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে, সে সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহন করতেও পারছিনে, ত্যাগ করতেও পারছিনে।" —জীবনের সমস্ত ঘটনাকেই ত্যাগ না করিয়া বহন করিতে

হইবে। আজ সামঞ্জস্য বিমলা কেমন করিয়া আনিবে? জীবনের সেই প্রথম দিনটাতে, জীবন যেদিন আরম্ভ করা গিয়াছিল—সেই দিনটাতে আবার ফিরিয়া যাইয়া প্রথম হইতে আর একবার জীবন আরম্ভ করিবার ইচ্ছা অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। জীবনে যাহা জানিবার ও বুঝিবার ছিল তাহা করিতেই এতদিন গেল, আজ যাহা জানা গেল তাহাকে জীবনে প্রকাশ করিতে, ফুটাইয়া তুলিতে আবার যৌবনের প্রয়োজন, সেই প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিবার প্রয়োজন বোধ করা যাইতেছে। বিমলা বলিতেছে যে দেবতার বাঁশির সুরটি ছাড়া তাহার জীবনকে আর কিছুতেই জুড়িতে পারিবে না, সেই সুরটিই শুধু তাহার জীবনকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। বিমলার অন্তর আজ তাহারই জন্য কাঁদিয়া ফিরিতেছে। এই কান্না, এই প্রার্থনা বিমলাকে নিজের ভিতর হইতে সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বুকের মধ্যে স্বামীর পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র কান্নার মধ্য দিয়া বিমলা নিজেকে পাইল, স্বামীকে পাইল, সমস্ত বিশ্বকে যাহার যথাস্থানে সত্য বাস্তবরূপে পাইল।

এইবার সে স্বচ্ছ হইয়াছে—সে আগুণের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। "যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে, তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।"

ইহার পর কাহিনী যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহা এই—মুসলমানদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সন্দীপ উত্তরের

গাড়ী ধরিতে ছুটিয়াছে, কেননা তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন আছে; মাষ্টারমহাশয়ের মুখে নারীর প্রতি মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া নিখিল ঘোড়া ছুটাইয়া সেইস্থানে চলিয়া গিয়াছিল, সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া অচেতন অবস্থায় ফিরিয়াছে; কচি মূরলী বাঁশটির মত কাঁচা বিমলার সেই অমূল্য সেই আহবে নিজের প্রাণটি রাখিয়া আসিয়াছে।

এমনই হয়। প্রকৃতিকে এমন করিয়াই কিছু দিতে হয়, প্রকৃতি কিছু গ্রহণ করিয়াই থাকে। নিজের না বুঝিয়া চলার মধ্য দিয়া বিমলা প্রকৃতির উপর যে অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাকে সেজন্য কিছু মূল্য দিতেই হইবে। স্বামীকে সে পাইল অচেতন অবস্থায়, কী হয় বলা যায় না; নিজের মাতৃহৃদয়ের আস্বাদন ঘটিয়াছিল যে ক্ষুদ্র কচি ছেলেটির মধ্যে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার নিজের জীবন স্থিত হইতে বিশেষ সাহায্যই পাইয়াছিল—সেই ছেলেটিকে বলি দিতে হইল। অন্তরের দিক হইতে সে আবার স্থিত হইয়াছিল; জীবনটা ঝড়ের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া যাহা ছিল, তাহাতে হয়তো ছিল সবই কিন্তু বাহিরের দিক হইতে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতেই হয়, মূল্য দিতেই হয়—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম বা প্রকৃতির প্রতিহিংসা।

"ঘরে-বাইরের" মধ্যে জীবনের একটি সমগ্র রূপের চিত্র আঁকিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করাই যদি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য হইত, তবে সেরূপ করার প্রচুর অবসর "ঘরে-বাইরের" মধ্যে

ছিল। হৃদয়াবেগের আতিশয্য যেখানে নাড়ীপীড়নকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমন অবস্থাতেই অনেকেই উপন্যাসের সমাপ্তি টানিতেন। কিন্তু পরিপূর্ণতার যে-সৌন্দর্য তাঁহার লক্ষ্য তাহারই ফলে জীবনচক্রের একটি পূর্ণ আবর্তন দেখাইবার একটি প্রয়াস ইহার মধ্যে আছে। কবি ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রাজেডি করিতে চাহিলে তাঁহার জন্য বহু সন্ধিক্ষণই তিনি সৃষ্টি করিতে পারিতেন। "ঘরে-বাইরের" মধ্যে মৃত্যু আছে, আঘাত আছে, বিমলার পরিবর্তন কিরূপ তাহারও প্রশ্ন হয়তো চলে। তবু ইহাকে এক নিশ্বাসে ট্রাজেডি বলা যায় না। নূতন আবেষ্টনীতে নিখিল-বিমলা-সন্দীপ ভবিষ্যতের যাত্রাপথে চলিতে পারিবে কিনা সে-চিত্র কবি আঁকেন নাই। কিন্তু যে-ঘনান্ধকারের গহ্বরের দিকে যাত্রা করিয়াছিল বলিয়া বিমলা নিজে বলিয়াছে—সে-গহ্বর হইতে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। যে দুর্যোগ নিখিলের জীবনে ঘনঘটা করিয়া ঝাঁকিয়া আসিয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়া সূর্যালোকের জ্যোতিতে উহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—এ-কথার মধ্যে সংশয়ের অবকাশ যদিও থাকে তবু সেই দুর্যোগের মধ্যেই যে উপন্যাস শেষ হয় নাই—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। সন্দীপ বিমলাকে শেষমুহূর্তে হৃদপিণ্ডমালিনী বলিয়া বন্দনা করিয়া গেল বটে কিন্তু সে ইহাও জানিয়া গিয়াছে এবং বলিয়াও গিয়াছে যে বিমলার নিকট হইতে দূরেই সে বিমলাকে সত্য করিয়া পাইবে।

বিমলা স্বীকার করে চন্দ্রনাথবাবু এমন একটা শিখরে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন যে-স্থান হইতে দেখিলে জীবনের পরিধিটা

একমুহূর্তেই বড় হইয়া দেখা দেয়। তখন বরাবর যেটাকে সীমা বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, দেখা যায় সেটাই সীমা নয়। কিন্তু এতখানি বুঝিয়াও বিমলা বলিতেছে—"কিন্তু কী হবে। আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে-নেশায় আমাকে পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারি নে। সংসারের দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে পলে কালো হয়ে মরুক, কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিঁকে থাক এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি নে।" বিমলা আবার বলিতেছে —"সবই বুঝলুম কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে।" —ইহা বিমলার নিবিড় মোহাচ্ছন্ন অবস্থার কথা। কিন্তু এই বিমলাই যখন নিজেকে নিজের মধ্যে একটু একটু করিয়া স্থাপন করিতে পারিতেছে তখন সে এক সময়ে বলিয়াছে—"...কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে—এবার দুর্বলকে দেখতে পেয়েছি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।" ইহার পরেও যে বিমলা অভিভূত হয় নাই তাহা নহে, এবং সেই অভিভূত হওয়ার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তবু পূর্বের মোহাচ্ছন্ন অবস্থা যে তাহার পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে—একথার প্রমাণ পরে আছে। সন্দীপের যে আকর্ষণী-শক্তি তাহাকে অভিভূত করিয়া ছিল, তাহাই যে সন্দীপের একমাত্র স্বরূপ নহে, তাহার মধ্যে যাহা নিতান্ত সাধারণ ও নেহাৎ দুর্বলতা, তাহার পরিচয়ও যে বিমলার চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে কথাও আমরা ইহার পরেই পাইয়াছি। ক্রমেই বিমলা প্রকৃতিস্থ হইতেছে যে-বিমলা সমস্ত 'বুঝিয়াও

একদিন স্পষ্টভাবে বলিয়াছে—"কিন্তু কী হবে... ।...মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে" ইত্যাদি ; সেই বিমলাই ইহার পরে বলিতেছে—"কিন্তু মানুষ যখন বদলে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন ? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে কেবল নড়ে চড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিল, আজ তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল, আজ তা ধূলোয়। সেইজন্যেই তো বুক ফেটে যাচ্ছে।" এই দুই অবস্থা কি বিভিন্ন নয় ? তাই তো বলিতে হয় যে-ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হইতে চলিতেছিল, সে ট্রাজেডি রুদ্ধ হইয়াছে।

বিমলা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল—একটা কোনও দয়া, কোনও আশ্রয়, ক্ষমার আভাস, এমন আশ্বাস যে সব চুকিয়া যাইতেও পারে। সেই সময় নিখিল উপস্থিত ; তখন "আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে সেই দেবতার সিংহাসনই নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না।···বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম—ওই পায়ের চিহ্ন চির জীবনের মতো ওইখানে আঁকা হয়ে যায় না কি ?—এইবার তো সব কথা খুলে বললেই হতো। কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে ?" ইহার পরে যখন সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল, নিখিল সবই জানিতে ও বুঝিতে পারিল এবং সমস্তই নিঃশব্দে গ্রহণ করিল তখন নিখিল যে গভীর প্রেমের পরিচয় দিল তাহা বিমলাকে আর একবার কাঁদাইল। এইখানে বিমলার মনস্তত্ত্বের যে অবস্থা হইল তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ আর কবি দেন নাই—দিবার দরকারও নাই বলিয়াই মনে হয়। ইহার পরের অবস্থার যদি একটি বিস্তৃত চিত্র দেওয়া হইত তবে

তাহা যে উপন্যাসের কাব্যাংশকেই মাটি করিয়া দিত তাহা নয়, নয় বৎসরের বিবাহিত জীবনে যে-প্রেমের সম্বন্ধটি ছিল, তাহা একেবারেই অর্থহীন ও মর্যাদাহীন হইয়া পড়িত। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাই সে চেষ্টা করেন নাই। তিনি মাত্র কয়েকটি কথায় ইহার পরের চিত্রটি তুলিয়া ধরিলেন। এবং এই কয়েকটি কথার চিত্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে ইহাকে প্রকাশ করিতে গেলেই বোধহয় তাহা সমস্ত কিছুর সঙ্গে বিসদৃশ হইয়া পড়িত। নিখিল বিমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেই—বিমলা জোর করিয়া নিখিলের পায়ে মাথা রাখিয়া বার বার প্রণাম করিতে লাগিল। নিখিল পা সরাইয়া নিতেই সে বলিয়া উঠিল—"না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে পূজো করতে দাও।" ইহারও পরে নিখিল ও বিমলার দুই-একটি আলাপ আছে। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাস্থলে নিখিল চলিয়া যাওয়ার পরে নিজের মরার কথা বিমলা আর একবার ভাবিয়াছিল, কিন্তু পথের ধারের জানালা ছাড়িয়া পিস্তল লইতে যাইতেও তাহার পা উঠিল না—"আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।"—এই সমস্ত দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে বিমলা যে শুধু একটি আসন্নপ্রায় ট্রাজেডি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল তা নহে; তাহার চক্রাকারে ভ্রাম্যমান মোহাচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধিও স্থির হইয়া আসিয়াছিল। এবং সেই সময়ের জন্য তাহার অন্তরের মধ্যে নিখিলের যথাযোগ্য আসনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অপর দিকে বিমলার প্রথমদিনের কান্নার পর মেজোরাণীদিদির

সঙ্গে কথা হইবার আগে নিখিল প্রথমেই যে কথাকয়টি বলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে এই সংসারের সঙ্গে মিলন যে চলার মুখের মিলন—এই সত্যটিই উপলব্ধি করিয়া নিখিল অতৃপ্তির মধ্যেও তৃপ্তি, সংসারের চিরন্তন বিরহের মধ্যেও চিরন্তন মিলনের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে।—"যতদূর পর্যন্ত একপথে চলা গেল ততদূর পর্যন্তই ভালো—তার চেয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন।" এই কথাটি বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই সে বলিতে পারিল—"সামনে যে বাঁশি বাজছে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুনতে পাই, বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্যের ঝরণা ঝড়ে পড়ছে।" সেইদিনই বেলাশেষে বিমলা যখন আর একবার উচ্ছ্বসিত আবেগের কান্নায় নিখিলের পায়ে বার বার প্রণিপাত করিতেছিল, তখন নিখিল বলিল—"আমি তখন চুপ করে রইলুম, এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে? যে-পূজা সত্য, সে-পূজার দেবতাও সত্য—সে-দেবতা কি আমি যে সংকোচ করব?"—নিখিলের এই কথায় মনে হয় এ-পূজা যে সত্য ছিল, সে-কথা নিখিল উপলব্ধি করিল।

সংসারে চলার পথের যে-সত্য সে অল্প আগে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে এবং বিমলার প্রেমের সম্পর্কে যে-সত্যকে সে আজ দেখিতে পাইল এইগুলি প্রমাণ করে যে তাহার জীবনে যে-ট্রাজেডি ঘটিবার জন্য সে নিজে দায়ী ছিল, সেই দায় হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছে।

তবে ইহাকে কমেডিই বলা যায় কি? এক নিশ্বাসে কমেডিও বলা যায় বলিয়া মনে হয় না। কালিদাসের শকুন্তলা

যেখানে শেষ হইয়াছে, এখানে কবি ততখানি অগ্রসর হন নাই। মহাকবি গেটে বলিয়াছিলেন শকুন্তলার মধ্যে ফুল ও ফল, স্বর্গ ও মর্ত্য একত্র পাওয়া যাইবে। "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যতখানি অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সংঘর্ষমূলক মনোভাব ও তাহার পরিণতির সম্ভাবনা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন। বিশ্লেষণের পথে উপন্যাসগত চরিত্রগুলির আবেষ্টনগত ব্যর্থতার তিনি পরিপূর্ণ চিত্রই দিয়াছেন; মাঝ পথেই ছাড়িয়া দেন নাই। চরিত্রগুলির মনস্তাত্তিক পরিবর্তনের খোঁজও দিয়াছেন। কাহার কোথায় ব্যর্থতা বলিয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে সার্থকতা লাভের প্রয়াসের আভাসটুকুও কিছু পরিমাণে ফুটাইয়াছেন। তবে ব্যর্থতার চিত্র তিনি যেরূপ বিশদভাবে আঁকিয়াছেন, সার্থকতা প্রয়াসের চিত্র তেমন করেন নাই। পরবর্তী জীবনের কোন নির্দিষ্ট চিত্র তিনি দেন নাই। পরিবর্তিত মনোবৃত্তি লইয়া আবার নূতন আবেষ্টনে তাহারা চলিতে পারিবে কিনা কবি সে সম্বন্ধে প্রায় নীরব; তবে তাহার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া একটু ইঙ্গিত দিয়াছেন। তারপর একটা প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সম্মুখে আমাদের ছাড়িয়া দিয়া লেখনী থামাইয়াছেন। ট্রাজেডি বা কমেডি কিছুই চূড়ান্তভাবে না বলিয়া সম্মুখের দিক খোলা রাখিয়া কবি বিদায় হইয়াছেন। তথাকথিত হৃদয়াবেগকেও যেমন প্রধান আসন দিয়াই সমাপ্তি টানেন নাই—তেমনি শকুন্তলার রচয়িতার মত ফুল ও ফল, স্বর্গ ও মর্ত্য একত্র করিয়া দেখান নাই। তিনি জীবনের বিশেষ আবেষ্টনের বিশ্লেষণই করিয়াছেন, 'synthesis

বা সংশ্লেষের পূর্ণ ও স্পষ্ট চিত্র আঁকেন নাই, শুধু ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন গভীর হইয়া আসে —ইহার পরের চিত্র কী হইতে পারে? জীবনের এই বিশ্লেষণ তো অনেকেই অনেকভাবে দিয়া গিয়াছেন কিন্তু সার্থকতা-লাভের কি কোন পথ নাই? সমন্বিত জীবনের চিত্র কি কোন দার্শনিক কবি আঁকিবেন না? সমন্বিত জীবন-দর্শন তো ভারতবর্ষে নূতন নহে। বহুবর্ষ ধরিয়াই ভারতের জল-বায়ুতে যেরূপ বিভিন্ন জীবন-দর্শন ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার সাহায্যে একটি পরিপূর্ণ জীবন চিত্র কি আঁকা যায় না? রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত উপাদানের ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে কি রূপ দেওয়া যায় না? উপন্যাসখানিকে সমালোচনা করিবার সময় আমরা এমনই একটি সমন্বিত-জীবন-পদ্ধতির ধারণা মনে রাখিয়া লিখিয়াছি। যতগুলি মৌলিক পদার্থ লইয়া মানুষ গঠিত, সেই সবগুলি মৌলিক বস্তুরই যে বাস্তবতা আছে, প্রত্যেকেরই যে জীবনক্ষেত্রে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার শক্তি রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই যে একটি বিশিষ্ট মূল্য দাবি করে, কোনটিকেই যে জীবন হইতে বাদ দেওয়া যায় না—এই সত্যগুলি যেদিন প্রত্যেক মানুষ জীবনে স্বীকার করিয়া লইবে এবং আয়ত্ত করিবে, যেদিন দৈহিক, মানসিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই সে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, যেদিন মানুষ কর্ম-জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেকটি অবস্থাকে সম্মান দিবে সেইদিন সে একটি পূর্ণাবয়ব মানুষ নামের সার্থকতা সিদ্ধ করিবে। মানুষের মধ্যে প্রত্যেকটি মৌলিক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ আছে

বলিয়া কোন একটির আধিক্য অপরগুলির আক্রোশমূলক আক্রমণ সৃষ্টি করিবেই। তাই চাই সমন্বয়; কিন্তু সমন্বয় কেবল মানুষের অন্তর্নিহিত মৌলিক পদার্থগুলির নয়, প্রত্যেক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাহিরে যে-জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে সেই জগতের প্রতি শক্তিটির সাথেও সমন্বয়।